নূতন কলমে

কিছু শিখবো, কিছু লিখবো

দিনহাটা মহাবিদ্যালয়ের একটি বাংলা বিভাগীয় গবেষণামূলক সাময়িক ই-পত্রিকা

প্রথম বর্ষ • প্রথম সংখ্যা

ফেব্রুয়ারী ২০২৪

নূতন কলমে

কিছু শিখবো, কিছু লিখবো

দিনহাটা মহাবিদ্যালয়ের একটি বাংলা বিভাগীয় গবেষণামূলক সামায়িক ই-পত্রিকা

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারী ২০২৪

প্রকাশনায়:

সাহিত্য ও গবেষণা বিষয়ক মণ্ডলী

(যৌথ সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক সমিতি'র তরফে)

বাংলা বিভাগ
দিনহাটা মহাবিদ্যালয়

NUTAN KALAME a departmental research periodical e-journal of Department of Bengali, Dinhata College; Published by “Sahitya O Gabeshana Bishayak Mandali” on behalf of the “Joutha Sahitya-Sangskriti Bishayak Samiti”.

First year, First issue

Exchange price: Free

© Department of Bengali, Dinhata College

সাহিত্য ও গবেষণা বিষয়ক মণ্ডলী

প্রকাশক:
শুভ্রা কর্মকার

অতিরিক্ত প্রকাশক (কোষাগার):
শ্রাবণী রায়

যুগ্ম সম্পাদক:
ধৃতিমান চৌধুরী
শ্রীময়ী সাহা

সহযোগী সম্পাদক:
সুস্মিতা রায়
প্রীতম দে
মৌসুমী পারভীন

প্রকাশ তিথি: ০৭ই ফেব্রুয়ারী ২০২৪, বুধবার

উপদেষ্টা মণ্ডলী:
ড. অমিতাভ দত্ত
ড. শুচিস্মিতা দেবনাথ
ড. সুভাষ চন্দ্র দাস
ড. জয় দাস
শ্রী শুভদ্বীপ সরকার
শ্রীমতি অন্বেষা বর্মণ

পৃষ্ঠপোষক: ড. আব্দুল আওয়াল
অধ্যক্ষ, দিনহাটা মহাবিদ্যালয়

প্রচ্ছদ:
ইমরান নাজির পাটোয়ারী
অলংকরণে:
রমজান আলী
পাণ্ডুলিপি সংশোধন:
সাহিত্য ও গবেষণা বিষয়ক মণ্ডলী

ই-মেইল:
publisher.nutankalame@outlook.com

বিশেষ সহযোগীতায়

সভাপতি ও পারিষদ : সাধারণ সমিতি

সভাপতি:
রিক সাহা

সহযোগী সভাপতি:
রমজান আলী
রাহুল দাস

মুখ্য আহ্বায়ক মণ্ডলী

মুখ্য আহ্বায়ক:
লিমন হক

সহযোগী মুখ্য আহ্বায়ক:
জিসান আহমেদ
শুভঙ্কর বর্মণ

আহ্বায়ক (কোষাগার):
বন্দনা বর্মণ

আহ্বায়ক (প্রচার ও কার্যালয়):
কুণাল কুন্ডু

আহ্বায়ক (অনুষ্ঠান):
সম্রাট সরকার
আব্দুর ফারুক

আহ্বায়ক (সমন্বয়কারী):
বিশ্বদীপ সাহা
সীমা সন্ন্যাসী
শ্রেয়া চক্রবর্তী

শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের শুভেচ্ছা পত্র

DINHATA COLLEGE

Accredited by NAAC (First Cycle) Grade:B+

P.O. DINHATA, DIST. COOCH BEHAR, PIN- 736135

Website : www.dinhatacollege.ac.in Email ID : principal@dinhatacollege.ac.in Mob : 9475104771

Date: 05.02.2024

শুভেচ্ছা পত্র

দিনহাটা মহাবিদ্যালয়ের একটি বাংলা বিভাগীয় গবেষণামূলক সাময়িক ই-পত্রিকা "নূতন কলমে"র প্রথম তথা আত্মপ্রকাশকারী সংখ্যার জন্য রইল অফুরান শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। "নূতন কলমে"র উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

শুভেচ্ছান্তে—

(ড. আব্দুল আওয়াল)
অধ্যক্ষ
দিনহাটা মহাবিদ্যালয়

বিভাগীয় অধ্যাপকবৃন্দের শুভেচ্ছা পত্র

বাংলা বিভাগ
দিনহাটা মহাবিদ্যালয়

শুভেচ্ছা পত্র

দিনহাটা মহাবিদ্যালয়ের একটি বাংলা বিভাগীয় গবেষণামূলক সাময়িক ই-পত্রিকা "নূতন কলমে"র প্রথম তথা আত্মপ্রকাশকারী সংখ্যার জন্য রইল অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। "নূতন কলমে" বাংলা বিভাগের পাশাপাশি গোটা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলুক এই আমাদের কামনা। বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মণ্ডলী সদা সর্বদা "নূতন কলমে"র পাশে আছে।

"নূতন কলমে" এগিয়ে যাও।

তারিখ: ৫ই ফেব্রুয়ারী ২০২৪, সোমবার

শুভেচ্ছান্তে—

(ড. অমিতাভ দত্ত)

(ড. শুচিস্মিতা দেবনাথ)

(ড. সুতীর্থ চক্রবর্তী)

(ড. জয় দাস)

(শ্রী শুভদ্বীপ সরকার)

(শ্রীমতি অন্বেষা বর্মণ)

সম্পাদকীয়

বাংলা সাহিত্যের শিক্ষার্থীদের পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি, প্রয়োজন ব্যবহারিক সাহিত্যিক চর্চাও। আমরা যখন দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ চুকিয়ে মহাবিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ করতে আসি, তখন আমরা শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বেঁধে দেওয়া কয়েকটি পাঠে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখি। আমাদের বেশিরভাগই নোট নির্ভর পড়াশোনায় মত্ত, একথায় কোনো দ্বিমত থাকতে নেই। তবে নোট নির্ভরতা একটা নির্দিষ্ট সময় অবধি আমাদের বৈতরণী পারাপার করাতে পারে কিন্তু লম্বা রেসের ঘোড়া হতে হলে আমাদের হয়ে উঠতে হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে গেলে পড়তে হবে, বুঝতে হবে আর লিখতে হবে। তবে আমরা তো মানুষ; অভ্যাসের দাস নামে আমাদের খ্যাতি বহুপুরনো। আর অভ্যাস একদিনে হয় না, যার জন্য প্রয়োজন অনুশীলন। আমরা কেউই এই অভ্যাসের সাথে অভ্যস্ত নই তাই আমাদের মধ্যে এই অভ্যাসের বীজকে বপন করার সদ্ অভিসন্ধি নিয়ে দিনহাটা মহাবিদ্যালয়ের একটি বাংলা বিভাগীয় গবেষণামূলক সাময়িক ই-পত্রিকা “নূতন কলমে”:কিছু শিখবো, কিছু লিখবো আজ তার প্রথম তথা ফেব্রুয়ারী ২০২৪ সংখ্যা প্রকাশের মাধ্যমে শুভ আত্মপ্রকাশ লাভ করলো।

আমরা আশা রাখছি বাংলা বিভাগ, দিনহাটা মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়, অধ্যাপক মণ্ডলীর সার্বিক সহযোগিতায় ও দিনহাটা মহাবিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় “নূতন কলমে” বাংলা সাহিত্য জগতের একটি “বঙ্গদর্শন” হয়ে উঠবে আর বাংলা বিভাগ হয়ে উঠবে “বাংলা সাহিত্যের প্রাবন্ধিকদের কারখানা”।

ধন্যবাদান্তে—
ধৃতিমান চৌধুরী ও শ্রীময়ী সাহা
যুগ্ম সম্পাদকদ্বয়

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা
১.	আধুনিক সমস্যা »› সম্পা মোদক	১
২.	বেকারত্বের সাথে সংঘাত »› পায়েল সাহা	৭
৩.	নববৃন্দাবন নাটকের উদ্দেশ্যমূলকতা ও কাল প্রসঙ্গ »› অশোক বর্মণ	১১
৪.	নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্প : সমাজ ও বৈধব্য জীবন »› মধুমিতা ঘোষ	১৫
৫.	প্রতিবাদের ভিন্ন কাহিনী: ‘সুবর্ণলতা’ »› কেয়া কর্মকার	২১
৬.	বীরাঙ্গনা কাব্যের পরিপূরক উত্তর বীরাঙ্গনা কাব্য »› ড. জয় দাস	২৮
৭.	যখন গরীব হয়ে যাই »› ইমরান নাজির পাটোয়ারী	৩৪
৮.	বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি: বিষ্ণুপুরের দুই দিন »› অমর বর্মণ	৩৬
৯.	শিক্ষা ব্যবস্থায় বিলেতিপনার অবলুপ্তি প্রয়োজন »› ধৃতিমান চৌধুরী	৪১
১০.	একটি ঐতিহাসিক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা »› খুশবু পাটোয়ারী	৪৬
১১.	স্বাধীনতা-উত্তর বঙ্গদেশের খন্ডচিত্র »› ড. সুভাষ চন্দ্র দাস	৫০

আধুনিক সমস্যা

সম্পা মোদক
স্নাতকরত (দ্বিতীয় অর্ধবর্ষ), বাংলা বিভাগ, দিনহাটা মহাবিদ্যালয়

পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি হওয়ার পর থেকেই সময় কালের সাথে সাথে সমস্ত কিছুর পরিবর্তন হতে শুরু করে।আর পরিবর্তন হতে হতে আজকের এই সময়ে আমরা এসে পৌঁছেছি। প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান সময় ধরলে দেখা যায় একাল ও সেকালের মধ্যে পার্থক্য আকাশ-পাতাল। সেই সুন্দর পরিবেশ থেকে শুরু করে সুন্দর মানুষ এমনকি যে কোনো কিছুর সাথেই মিল পাওয়া বড্ড কঠিন।সব কিছুর পরিবর্তনের মূল কারণ হচ্ছে বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের কারণে আজকের সভ্যতা এত উন্নত। বিজ্ঞান আছে বলেই নতুন সৃষ্টি আছে,সব কিছুতেই বিজ্ঞানের প্রভাব রয়েছে, বিজ্ঞান ছাড়া চলা অসম্ভব। সেই বিজ্ঞানের সুপ্রভাবেই আজকে পৃথিবী এত উন্নত এবং একই বিজ্ঞানের সৃষ্টিকে অপব্যবহার করে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সমাজ। বতর্মান সময়ের মূল আধুনিক সমস্যা হলো সকলের হাতে ব্যবহৃত স্মার্টফোন। শিশু থেকে শুরু করে বয়স্ক সকলের উপর প্রভাব পরেছে এই স্মার্টফোনের। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের কথা ভেবে প্রায় ১৮৭৬ সালে টেলিফোন আবিষ্কার করা হয় তখন এরকম আধুনিক সমস্যার কোনো ছিটে ফোঁটাও ছিল না। প্রায় ১৯৭৩ সালের দিকে মোবাইল ফোন আবিষ্কার হয়।১৯৭৩ সালের ৩ এপ্রিল মার্টিন কুপার সর্বপ্রথম মোবাইল ফোন থেকে কল করেছিলেন। ফোনটির নাম ছিল ডায়না টিএসি (Dyna TAC)। এখনকার সময়ের মতো ফোনটি হালকা ছিল না। ওজন ছিল প্রায় ১ কেজি বা ২.২ পাউন্ডের। দৈর্ঘ্যে প্রায় ৯ ইঞ্চি, উচ্চতায় ৫ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ১.৭৫ ইঞ্চি। সেই ফোনের ব্যাটারি চার্জ করতে অনেক সময় লাগতো এবং সেই চার্জ দিয়ে প্রায় ২০ মিনিট কথা বলা যেত। তারপর ধীরে ধীরে সমস্ত কিছুর উন্নতি হতে শুরু করে এবং মোবাইল ফোনের আকার ছোট হতে থাকে। আগে মোবাইল ফোনের আবিষ্কার হয় শুধুমাত্র কথা বলার জন্য, কিন্তু পরে শুধু কথা বলা ছাড়াও আরো অনেক কিছুর ব্যবস্থা করা হয়।

টেলিফোনের সময় থেকে আজকের সময়টা অনেকটাই আলাদা। সেই টেলিফোন ছিল কোনো দরকারি অফিসে বা কোন সংস্থায় আবার অনেক ধনসম্পত্তির অধিকারী ব্যক্তিদের বাড়িতেও দেখা যেত। অনেক দোকানে টেলিফোন রাখা হতো সেখানে সাধারণ মানুষরা তাদের দরকারি যোগাযোগ করার জন্য টাকা দিয়ে ফোনে কথা বলতো ।তারপর তার ছাড়া ফোন আবিষ্কার হলো, এবং ধীরে ধীরে নানান ফোনের বাহার তৈরি করা হলো। সাধারণ থেকে অতি সাধারণ সবার বাড়িতেই মোবাইল ফোন দেখা গেল। এখন শুধু বাড়িতেই নয় একটি বাড়িতে যতজন সদস্য তাদের প্রত্যেককেই আলাদা আলাদা মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে দেখা যায়। মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে তৈরি করা হয়েছিল মোবাইল ফোন কিন্তু তার কারণে বর্তমান সমাজে যে প্রভাব পড়ছে সেটা তারা যদি মোবাইল ফোনের আবিষ্কারকরা দেখতে পারতেন তাহলে হয়তো নিজেদের সৃষ্টির জন্য আফসোস করতেন সাথে সমাজের জন্যেও।

আগে আবিষ্কৃত মোবাইল ফোনের আকার ও বড় ছিল দাম ও তেমন বেশি ছিল। আবিষ্কারক মার্টিন কুপার জানতেন একসময় মোবাইল ফোনের আকার ও তার দাম দুটোই মানুষের হাতের মুঠোয় চলে আসবে। বর্তমান সময়ের মোবাইল ফোন আগের মোবাইল ফোনের চেয়ে অনেক আলাদা,ধীরে ধীরে সবকিছুতে অনেক পরিবর্তন এসেছে এখন স্মার্ট ফোনের তুমুল জনপ্রিয়তায় আগের ছোট মোবাইল ফোন বলতে গেলে হারিয়েই গেছে। শুধু প্রাথমিক টেলিযোগাযোগ সুবিধা পাওয়া যায় যে ফোন থেকে তাকে ফিচার ফোন বলে। আমার দেখা মনে পড়ে নোকিয়া ফোনের কথা যেটাকে বেসিক ফোন বলে। পরবর্তীতে এই বেসিক ফোনগুলোতে আরো নানান নতুন বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়। মোবাইল ফোনে মিউজিক, ক্যামেরা, ভিডিও এসব সুযোগ সুবিধা যোগ হয়। এগুলোকে মাল্টিমিডিয়া ফোন বলা হয়। মাল্টিমিডিয়া ফোনের পর আসে স্মার্টফোন। ১৯৯৪ সালের ১৬ আগস্ট বিশ্বের প্রথম স্মার্টফোন তৈরি হয়েছিল। ফোনটির নাম ছিল সিমন,এই স্মার্টফোনটি বর্তমানে লন্ডনের জাদুঘরে রাখা হয়েছে। মাল্টিমিডিয়া ফোনের সুবিধা গুলোর সাথে যুক্ত হয় আরো উন্নত ক্যামেরার সুবিধা, ওয়াইফাই ব্যবহার, টাচ স্ক্রিন এবং অনেক রকম অ্যাপসের সুবিধা। আধুনিক মোবাইল ফোন গুলোতে কথা বলার পাশাপাশি টেক্সট মেসেজ,মাল্টিমিডিয়া মেসেজ, ইন্টারনেট সেবা, ই-মেইল ব্যবহার,ভিডিও কলিং,ভিডিও গেম,ব্লুটুথ সেবা,অফিসের জন্য তথ্য আদান প্রদান করা,টিভি দেখা ইত্যাদি সবকিছু সুবিধাই পাওয়া যায়।

১৯৯০ সাল থেকে ২০১১ পর্যন্ত পুরো পৃথিবীতে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় সাড়ে ১২ মিলিয়ন থেকে প্রায় ৬ বিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮৭ শতাংশ এখন মোবাইল যোগাযোগের আওতায় এসেছে। ২০১৬ সালের গণনা অনুযায়ী প্রায় ৬৩ শতাংশ লোকের নিজস্ব মোবাইল ফোন আছে। এইভাবেই সময়ের ক্রমবিকাশের সাথে সাথে মোবাইল ফোন হয়ে উঠেছে আমাদের অন্যতম দরকারি একটি মাধ্যম। কোনো জায়গায় গেলে আমরা মোবাইল ফোন ছাড়ার কথা ভাবতেও পারি না, অন্য কোন দরকারি জিনিসের আগে আমরা মোবাইল ফোনকে সঙ্গে নেই এবং কোনো ডকুমেন্ট বা কাগজপত্রের দরকার পড়লে তো সেগুলোকে না নিয়ে গিয়ে ফোনে ক্যামেরা বন্দি করে নিয়ে যাই ।আর যেকোনো জায়গায় গিয়ে সেখানকার মুহূর্তকে ক্যামেরাবন্দি করতে ভুলিনা সেগুলোকে স্মৃতি হিসেবে রেখে দেই।

স্মার্টফোনের অনেক ধরনের অ্যাপস এর মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মানুষ।বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়াতে দিনের বেশিরভাগ সময় নষ্ট করে দিচ্ছে,যারা সোশ্যাল মিডিয়াকে নিজের পেশা করেছে তাদের কথা ছেড়েই দিলাম,তারা নিজের স্বার্থের জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় সময় নষ্ট করছে। কিন্তু আমাদের মতো সাধারণ ছেলে মেয়েরা নিজের মূল্যবান সময় নষ্ট করে ঘন্টার পর ঘন্টা সোশ্যাল মিডিয়া ঘাটছে। যে অ্যাপস গুলো বেশি পরিমাণে ব্যবহার করছে সেগুলো হলো ফেসবুক,ইনস্টাগ্রাম,টুইটার, লিংকইন, টেলিগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ ইত্যাদি। সারাদিন ফেসবুকে মিম শেয়ার অন্যের পোস্টের লাইক, কমেন্ট

এবং ইনস্টাগ্রামে রিল শেয়ার আর পোস্ট দেখে দিনের পর দিন নিজের জীবনের বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছে বর্তমান জেনারেশন। এটা যে আমাদের জীবনের ওপর কতটা প্রভাব পড়ছে আমরা সেটাতে কোন লক্ষ্যই করছি না। ঘন্টার পর ঘন্টা ফোনের আলোর দিকে তাকিয়ে থাকার কারণে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে চোখ। বেশিক্ষণ ফোনে কথা বলা এবং হেডফোন ব্যবহার করার জন্য কান ও মস্তিষ্কের ওপর প্রচণ্ড পরিমাণে চাপ পড়ছে। তাই এখন ডাক্তার-খানায় বা হাসপাতালে গেলে শিশু থেকে বয়স্ক সমান হারে দেখা যাচ্ছে।

শুধু সোশ্যাল মিডিয়া নয় কিছু কিছু ভয়ঙ্কর গেম এর জন্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে অনেক ছেলে মেয়ের জীবন। এই গেম গুলো এতটাই ভয়ংকর যে একবার এর নেশায় পড়লে সেখান থেকে বেরিয়ে আসা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। অনেকে তো মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে তাদের জগতে ফোন আর গেম ছাড়া কিছু নেই। সেই সব গেমের মধ্যে রয়েছে নীলতিমি, ইতিমধ্যেই এই ভয়ঙ্কর গেমটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তারপর রয়েছে ফ্রী-ফায়ার ও পাবজির মতো গেমগুলি যার জন্য নষ্ট হচ্ছে সমাজ। গেম খেলা ব্যক্তিদের কাছে এই লেখা গুলি হাস্যকর বলে মনে হতে পারে। কারণ তারা নিজেরাও জানে না নিজের জীবনের কতটা ক্ষতি করছে।২০২০ সালে করোনা ভাইরাসের কারণে লকডাউন হওয়ায় এই গেমগুলি ও সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাব সবার উপর বেশি পরিমাণে পড়েছে। তবে এই রকম যদি চলতে থাকে তাহলে সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলে-মেয়েদেরকে হয়তো চিড়িয়াখানায় দেখতে পাবে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম।

মোবাইল ফোন ছাড়া এ যুগে জীবন অচল। কিন্তু মোবাইল ফোন ব্যবহারের ফলে আমাদের শারীরিক সমস্যা হতে পারে সেই ব্যাপারে আমাদের সচেতন থাকা উচিত। আমরা যদি এই বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতন থাকি তাহলে আমরা অনেক বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারি। কথা বলা ছাড়াও ইন্টারনেট ব্যবহার,গান শোনা,ভিডিও দেখা,ছবি তোলা হিসাবে আবদানের দিক দিয়ে আগে মোবাইল ফোন। তাই সবার হাতেই আজ নানান রকমের স্মার্টফোন। কিন্তু আমাদের জানা দরকার যে কোনো কিছুর যেমন ভালো দিক রয়েছে তেমন খারাপ দিকও রয়েছে তাই তার পাশাপাশি তার খারাপ গুণগুলো জানা দরকার,যেমন মোবাইল ফোনের রেডিও-ফ্রিকোয়েন্সি খুবই উচ্চ মানের এই রেডিয়েশন থেকে ব্রেন ক্যান্সার ও চোখের ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রতিনিয়ত ফোনে একটানা অনেকক্ষণ কথা বলতে থাকলে তাদের ইয়ার ইনার ড্যামেজ ও ককলিয়ার সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইউরোপের কিছু বিজ্ঞানীরা বলেন বাঁ দিকের কানে ফোন ধরে কথা বললে ব্রেনের ক্ষতি কম হয় এবং আমেরিকান গবেষকরা বলেন ডান দিকের কানে ফোন ধরে কথা বললে মস্তিষ্কের সরাসরি ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। মোবাইল ফোনের বিচ্ছুরণের থেকে মাথায় যন্ত্রণা মাথা-ঘোরা এবং ব্রেনটিউমারও হতে পারে,এইসব বিভিন্ন ধরনের ব্রেন টিউমার হবার প্রবণতা বড়দের থেকে ছোটদের বেশি থাকে তাই ছোট ছেলে মেয়েদের মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে না দেওয়াই অতি

Your paraউত্তম কাজ। কিন্তু বর্তমানে মায়েরা তাদের সন্তানের হাতে নিজেরাই ফোন তুলে দিচ্ছে যাতে খাবার সময় কোন বায়না না করে সন্তান। কোন উৎসব যেমন দুর্গা পূজা,কালী পূজা,নববর্ষ এবং বিভিন্ন দিবসে আমরা আমাদের প্রিয়জন, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের শুভেচ্ছা জানাই হোয়াটসঅ্যাপে এবং সেখান থেকেই থামি না কে কি স্ট্যাটাস দিল কে কি পোস্ট করল এবং নিজের গোটা কয়েক পোস্টে কতজন রিয়েক্ট করল, সেসব দেখে সারাদিন পর একটু খেয়াল করলে দেখতে পারি আমাদের কাধ, কব্জি, ঘাড়ে যন্ত্রণা হচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে ফোনের দিকে তাকিয়ে থাকলে নানান অসুবিধা হতে পারে যেমন চোখ লাল হয়ে যাওয়া ও জালা ভাব, আই স্টোন,ড্রাই আই,ঝাপসা দৃষ্টি,রাতকানা ইত্যাদি আরো নানান রকমের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

শুধু চোখ কানের মত বাইরের অঙ্গেই নয় আমাদের ভিতরের অঙ্গগুলিতেও ভীষণ রকম সমস্যা দেখা দিতে পারে,মোবাইল ফোন থেকে নিঃসৃত হয় এক ধরনের কেমিকাল যা স্ত্রী জনন তন্ত্রের কার্যক্ষমতা নষ্ট করে দিতে পারে এবং সন্তান ধারণ করে যে সমস্ত নারী অত্যধিক পরিমাণে মোবাইল ফোন ব্যবহার করে তাদের ভূমিষ্ঠ সন্তান পরবর্তীকালে এ.ডি.এইচ.ডি-র মত সমস্যার শিকার হতে পারে। শুধু নারীদের ক্ষেত্রেই নয় পুরুষদের ক্ষেত্রেও প্রজনন সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দিতে পারে অত্যধিক ফোন ব্যবহার থেকে মানসিক ক্লান্তি বা ডিপ্রেশন ও ঘুমের সমস্যা হতে পারে। অনেক সময় মনোযোগ ও স্মৃতিশক্তি ধারণ ক্ষমতা কমে যাওয়ার মতো ঘটনাও ঘটতে পারে।

অতিরিক্ত মোবাইল আসক্তিরপ্রভাবে রিং-টোন অ্যাংজাইটি সমস্যা দেখা দেয়,এই সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তি ছোটখাটো যে কোনো শব্দে সতর্ক হয়ে পড়ে,মনে হয় তার মোবাইলের রিং-টোন বাজছে। আজকাল এই সমস্যাটা খুবই চোখে পড়ে, এমনকি আমি নিজের মধ্যেও এই সমস্যা লক্ষ্য করেছি। অনেকে এমনও আছেন বেশিক্ষণ ফোন না আসলে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। আবার ব্যক্তিগত জীবনের যাবতীয় তথ্য দরকারি কন্টাক্ট নম্বর ইত্যাদি সবই এখন মোবাইলে রাখা থাকে, এই আতঙ্কে আক্রান্ত ব্যক্তি সর্বদা ভয় বিহল থাকে এই বুঝি তার স্মার্টফোন হারিয়ে গেল। জনপ্রিয় স্মার্টফোনের কল্যাণে আমরা বিভিন্ন সোশ্যাল সাইটের প্রতি অধিক মাত্রায় আসক্ত হয়ে পড়ছি এর থেকে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। রাত জেগে ফোন দেখার ফলে ঘুমের ব্যাঘাত হয় এবং মেজাজ খিটখিটে হয়ে পড়ে, খিদে নষ্ট হয়,মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে। ফোনে বেশি কথা বলায় অভ্যস্ত ব্যক্তিদের মস্তিষ্কে গ্লুকোজ ধারন কম হয়, সাথে হৃদপিন্ডের গতি অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেতে পারে।

আমরা নিজেরা ইচ্ছা করলেই নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। কিন্তু আমাদের কখনো সেই রকম ইচ্ছাই হয় না। নিয়ন্ত্রণ তো অনেক পরের কথা বর্তমান সময়ে আমাদের মত ছেলে-মেয়েদের যদি স্মার্টফোন না চালাতে দেওয়া হয়, তাহলে তারা ডিপ্রেশনে চলে যাবে। মোবাইল ফোন ছাড়া তাদের ভাবনা আর কিছুই নেই কারণ আমরা হয়তো নিজেদের ভালো নিজেরাও চাই না। দিনের সব কাজের পাশাপাশি মোবাইল ফোন

ছাড়া তাদের ভাবনা আর কিছুই নেই কারণ আমরা হয়তো নিজেদের ভালো নিজেরাও চাই না। দিনের সব কাজের পাশাপাশি মোবাইল ফোন ব্যবহারও আমাদের প্রতিদিনের স্নান খাওয়ার মত হয়ে গেছে তাই আমরা এটাকে বাদ দিতে পারি না। কেউ যদি সত্যিই তার কুঅভ্যাসকে বদলাতে চায় তাহলে সে প্রতিনিয়ত কিছু নিয়ম মেনে চললেই মোবাইল ফোনের থেকে আসক্তি কমাতে পারে। দামি ফোন ছেড়ে একদম কম দামি একটা ফোন ব্যবহার করুন যাতে শুধু ফোন করা যায়,স্মার্টফোনটা কয়েকদিনের জন্য নজরের বাইরে রেখে দিতে হবে এতে প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হলেও পরে ঠিক অভ্যাস হয়ে যাবে। যাদের ফোন খুবই দরকারি কাজের বা পড়াশোনার জন্য তারা তাদের ফোন থেকে দরকারি অ্যাপস গুলো রেখে বাকি অ্যাপস গুলো সরিয়ে দিতে পারে। আর প্রত্যেকটা সিমের কোম্পানি কিছু ডাটা আর বেশি কলের প্যাক রাখে সেই রকম প্যাক ব্যবহার করলে আপনাদের ফোনে ডাটা কম থাকবে এবং অন্য কোন কাজে আপনারা নেট নষ্ট কম করবেন। আর এতেও যদি না হয় তাহলে প্রতিটা অ্যাপস এর মধ্যে টাইমার ব্যবহার করার সুবিধা রয়েছে,যেগুলি চালু করলে আপনি যে সময় দিয়ে রাখবেন তারপর সেটি এমনিতেই বন্ধ হয়ে যাবে। ফোন ঘাটার সময় গুলি যদি আপনি আপনার বাড়ির লোকের সাথে কাটান বা বন্ধুর সাথে আড্ডা দেন তাহলে আপনার ফোনের কথা অতটাও মনে পড়বে না,এতে ফোনের আসক্তি অনেকটাই কমানো সম্ভব। সোশ্যাল মিডিয়াতে গাদা গাদা মিম ছাড়া এমন কিছুই নেই যেগুলো ঘেটে আপনারা আপনাদের মস্তিষ্কের বারোটা বাজিয়ে দেন। বিশেষ করে গর্ভবতী মায়েদের ফোন থেকে দূরে থাকাই উত্তম আপনি একটা কথা ভেবে দেখবেন আপনার কাছে কোনটা গুরুত্বপূর্ণ আপনার ক্ষণিকের সুখ নাকি আপনার সন্তানের সুস্থতা।

শরীর থেকে ফোন যতটা সম্ভব দূরে রেখে মোবাইল ব্যবহার করলে রেডিয়েশন এর ভয় থাকে না। শরীর থেকে দূরে রেখে কথা বলার অভ্যাস করলে কান ও হাতে স্কিন ক্যান্সারের ভয় থাকে না। তাই স্পিকার অন করে মোবাইলে একটু দূর থেকে কথা বলাই ভালো। কানে ব্লু-টুথ লাগিয়ে কথা বলা একদম নিরাপদ নয় কারণ ব্লু-টুথ থেকে মোবাইলের মতো সমমাত্রায় রেডিয়েশন নির্গত হয়। ছোট ছোট দরকারের জন্য ফোন না করে টেক্সট করাই ভালো। মোবাইল ফোন পকেটে বা শরীরের সংস্পর্শে রাখা উচিত নয় কারণ মোবাইল ফোনের ভাইব্রেশন থেকে হৃদপিন্ডের সমস্যা হতে পারে। কেউ কেউ রাতে মোবাইল না ঘেটে শুতে যান না তারপর ঘুমের বারোটা বাজিয়ে ফোন রেখে ঘুমাতে যান,সকালে অনেক দেরিতে তাদের ঘুম ভাঙ্গে। শরীরের সুস্থতার জন্য এই কুঅভ্যাস ত্যাগ করুন,অন্ধকার ঘরে মোবাইল ফোনের আলোর দিকে তাকিয়ে থাকলে চোখের যে পরিমাণ ক্ষতি হয় তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। এক দু'মাস পরে পরে অন্তত পক্ষে তিন দিন মোবাইলে ফেসবুক অ্যাপটির ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন। এবং দশদিন পর পর সম্পূর্ণ একটা দিন সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার থেকে দূরে থাকুন। সারাদিনে দেড় ঘন্টার বেশি ফোনে কথা বলা উচিত নয়। দিনের পর দিন মোবাইল ব্যবহারে মোবাইলের নানা ধরনের জীবাণু বাসা বাঁধে সঠিকভাবে প্রতিদিন নিজের ফোনকে জীবাণুমুক্ত করা উচিত।

এই বিষয়ে গুলি ছাড়াও আরো নানান রকম পদ্ধতিতে মোবাইল ফোনের আসক্তি কমানো সম্ভব। আর মোবাইল ফোন কেনার সময় SAR নম্বর (Specific Abortion Rate) দেখে নেওয়া দরকার। SAR লেভেল ১.৬ ওয়াট পার কিলোগ্রামের কম হলে তা নিরাপদ SAR নম্বর যত কম হবে তত ভালো।

আমরা যদি নিজেরা উদ্যোগী না হই নিজেকে সতর্ক করতে, তবে কেউ আমাদের সতর্ক করতে পারবে না। তাই আসুন আমরা সতর্ক হই জীবাণুমুক্ত শুদ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি করি, আর আমরা সকলে সুস্থভাবে জীবন যাপন করি।

নূতন কলমে
কিছু শিখবো, কিছু লিখবো

বেকারত্বের সাথে সংঘাত

পায়েল সাহা
প্রাক্তন ছাত্রী, বাংলা বিভাগ, দিনহাটা মহাবিদ্যালয়
স্নাতকোত্তররত (প্রথম অর্ধবর্ষ) ,কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়

বেকারত্ব শব্দের অর্থ আমরা বলতে পারি কর্মহীন মানুষের অসহায় রূপ। বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন এই বেকারত্বের। কেউ বেকারত্বকে বড়ো করে বলেছেন কেউ বা ছোট করে, কিন্তু তাদের অর্থ একটাই 'কর্মহীনতা'।সকল দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে দেখা যায় বেকার দুরকম—
১) ইচ্ছাকৃতভাবে ভাবে কর্ম না করা
২) ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কর্ম না পাওয়া।
বলাবাহুল্য প্রথম ভাগের সংখ্যাটি যথেষ্ট কম হলেও পরের ভাগের সংখ্যাটি অপরিসীম রয়েছে।
অন্যান্য দেশেও বেকার রয়েছে, কিন্তু তার সাংখ্যমান যথেষ্ট কম। তাই তো আমাদের দেশ ভারতবর্ষ থেকে প্রচুর মানুষ কর্মের জন্য বিদেশে পাড়ি দেয়। যদিও আমাদের আলোচ্য বিষয় বিদেশ তথা অন্য দেশ নয়, শুধুমাত্র ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গ।
ভারতে বেকারত্বের বেশ কিছু কারনও রয়েছে। যথা—
১) ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি
২) শিল্পউন্নয়নে মন্থর গতি
৩) কুটির তথা ছোট শিল্পে কম বিনিয়োগ
৪) জনগণের দ্বারা গৃহীত উদ্যোগ কম
—এরকম অনেক কারণ রয়েছে বেকারত্বের।

বেকারত্ব শব্দটি ক্ষুদ্র হলেও বেকারত্বের প্রভাব প্রগাঢ়। আমাদের দেশে তথা রাজ্যে শিক্ষিত মানুষের অভাব হয়তো নেই তবে কর্মহীন মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে । তার জন্য কাউকে দায়ী করার দায় আমাদের নেই ঠিকই, তবে এর প্রভাব পড়ছে সমাজজীবনে। বেকারত্বের স্থূলতায় মানুষ অপরাধের জগতে প্রবেশ করছে, কারন দিনশেষে অপরাধীরও ক্ষিদে পায় তারও সংসারের প্রতি কর্তব্য রয়েছে। আর শিক্ষিত মানুষের কথা তো ছেড়েই দিলাম। কারন কষ্ট করে শ্রম দিয়ে পড়াশোনা করে কারি কারি নাম্বার নিয়েও তারা কোনো কাজ পায় না। দিন রাত হাতে সিভি নিয়ে ঘোরাঘুরি করে আর পড়ন্ত বিকেল হয়ে এলে অপেক্ষা করে এক নতুন সকালের। সমাজ কখনো তাদের বেদনায় বেদনাহত হয় না বরং প্রশ্ন তোলেন এত পড়াশোনা করে কী লাভ হল? সেই তো বাবার হোটেলেই খেতে হচ্ছে। দোষটা কার ঠিক বোঝা কঠিন।
কখনো দেখা যায় এই বেকারত্বের প্রভাবে একটা স্বপ্নময় সংসার ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছে। যে বাবা হয়তো স্বপ্ন দেখছে তার ছেলে বা মেয়ে সংসারের অভাব দূর করবে, সেই হয়তো এখন নিজের খরচটাই তুলতে সমর্থ হয়নি। এর দায় হয়তো আমাদেরই। কারন

আমরাই হয়তো সঠিক যোগ্যতা অর্জন করতে পারিনি।

কখনো দেখা যায় বেকারত্বের জ্বালায় মানুষ মানসিক রোগী হয়ে উঠছে। কখনো এই বেকারত্বের দায় এড়াতে মানুষ আত্মহত্যাকে মুক্তির উপায় হিসেবে বেছে নেয়। প্রতিনিয়ত হাজার হাজার মানুষ সংঘাত করে চলছে। এই বেকারত্বের প্রভাবে যদিও এর সংখ্যা কমবার চেয়ে বরং বেড়েই চলেছে।
বেকারত্বের কারনে তথা চাকরি নেই বলে চাকুরী প্রার্থী আন্দোলন করেই চলেছে, প্রতিদিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে তারা স্লোগান দিচ্ছে কিন্তু আমাদের সমাজ আজও নিঃশ্চুপ হয়ে রয়েছে।

পূর্বে যখন ইংরেজদের শাসন চলছিল তখন মানুষ বেকার ছিল কিন্তু অপরাধীর সংখ্যা কম ছিল। পূর্বেও বেকার ছেলের সঙ্গে কোনো মেয়ের বাবা তার মেয়ের বিয়ে দিতেন না আজও তা দেন না।

একবার এক সাহিত্যিকের লেখা নাটকে পড়েছিলাম ছেলে বেকারত্বের দায় এড়াতে সৈনিক পদে নিযুক্ত হলেও মেয়ের বাবা-মা ছেলের সৈনিক জীবনযাপনের পাশাপাশি তার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ও মেয়ের সেখানে বিয়ে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। অথচ ছেলেটি বেকার থাকলেও হয়তো মেয়ের বাবা বিয়ে দিতেন না। এখানে বিয়ে হওয়া না হওয়া বড়ো কথা নয় বড়ো কথা বেকারত্বের দায় এড়াতে ছেলেটির তার জীবনের ঝুঁকি নেওয়াটা।
পূর্বেও এরকম অনেক সম্পর্ক ভেঙে গেছে, ঠিকই কিন্তু পূর্বে মানুষ এতো শিক্ষিতও ছিল না তাই বেকারত্বের যন্ত্রনা ও তার প্রভাব কম পড়েছে।
কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশ-সমাজ-রাজনীতি অনেক এগিয়ে গেছে; ২০২৪ সালে দাঁড়িয়ে দেখা যায় শিক্ষার আলো ঘরে ঘরে পৌঁছে গেলেও বেকারত্ব, ক্ষুদার যন্ত্রনা আজও রয়ে গেছে; আজ হয়তো ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নেই ঠিকই, ডাস্টবিনের খাবার নিয়ে কুকুরের সাথে কাড়াকাড়িও নেই তবে মানসিক যন্ত্রনা রয়েছে সমাজের কুকথার শিকার হতে হয় বেকার ছেলে মেয়ে কে। কখনো কখনো হয়তো বাবা-মা'রও চক্ষুশূল হতে হয়, বন্ধুবান্ধবীও সম্পর্ক রাখতে চায় না। কিন্তু এর দায় কে নেবে? কোনো সহৃদয় ব্যক্তি কি এর দায় নেবে? তবে হয়তো সমাজ বেকারত্বের ভার থেকে আংশিক হলেও মুক্ত হবে। সমাজের বড়ো বড়ো মানুষেরা কি এই সমস্যার সমাধান করতে পারবে? কেউ দায় নেবে না, সবাই বলবে—কাজ হবে বেকারত্ব ঘুচবে, মানুষ খেতে পাবে, স্বাচ্ছন্দে বাঁচতে পারবে— এসব ক্ষীণ আর বৃথা আশা মাত্র।ঠিক কবি রবীন্দ্রনাথের এক উক্তির মতো—
"শেষ হয়ে হইল না শেষ"।
—সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত লড়াই, স্লোগান চলছিল আজও চলছে শুধু পার্থক্য সংখ্যার।

সম্প্রতি সংবাদপত্রের এক তথ্যের ভিত্তিতে আমরা জানতে পেরেছি, অসংখ্য শিক্ষিত উচ্চপদস্থ ডিগ্রি প্রাপ্ত ছেলে-মেয়েরা চাকরির সুযোগ পাবার আশায় বসে আছে। বেকারত্বের দায়ে তারা জর্জরিত। মূলত আমরা জানি যে পিএইচডি. যথেষ্ট বড়ো মাপের

ডিগ্রি প্রচুর পড়াশোনা করার পর কোনো শিক্ষার্থী সেই ডিগ্রি লাভ করে অথচ তারা সামান্য গ্রুপ ডি'র চাকরির জন্য আবেদন করছে; সমাজে কতটা বেকারত্ব রয়েছে বলে আমাদের আজ এই অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ক্রমশ তারা দিশাহারা হয়ে পড়ছে। যার দ্রুত থেকে দ্রুততর সমাধান প্রয়োজন। এদিকে বিএড., ডিএলএড. করে কত জন যে বসে আছে তার হিসাব দিতে গেলে সাধারণ মানুষের চক্ষু চড়কগাছ হবে। আবার কখনো দেখা যাচ্ছে স্কুলে-কলেজে শিক্ষক-শিক্ষিকার পদ হয়তো ফাঁকা, কিন্তু নিয়োগ নেই; যদিওবা নিয়োগ হয় তাও সংখ্যায় কম। এই নিয়োগের সংখ্যা বাড়ানোর বন্দোবস্ত করা দরকার। ২০২৩'র জুলাই মাসে স্টাফ সিলেকশন কমিশনের পরীক্ষায় চাকরি প্রার্থীর আবেদনের সংখ্যা বহুল পরিমাণে ছিল, কিন্তু নিয়োগ হয়েছিল হাতে গোনা কিছু সংখ্যক প্রার্থীর। আশা করি সবাই বুঝতেই পারছেন চাকুরী না পাওয়া ওই প্রার্থীরা আবার হয়তো অন্য চাকরির জন্য আবেদন করবে, আবার নতুন করে পড়তে বসবে, দেখা যাবে একদিন টুক করে বয়সের গন্ডি পেরিয়ে যাবে, আর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না; কষ্ট করে হয়তো একটা দোকান দেবে, দোকান দাঁড় হতে গিয়ে বিয়ের বয়স পার হয়ে যাবে, ভালো মেয়ে পাবে না। দিনশেষে শুধু থেকে যাবে আফসোস।

এই বেকারত্বের ভয়ে বাবা-মা'রা আজকাল তাদের ছেলেমেয়েদেরকে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে ভর্তি করে যাতে তাদের ছেলেমেয়েরা বেকারত্বের শিকার না হন। কোনো মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে ছেলেমেয়েরা যেন চাকরি পেয়ে যায়, হোক না সেটা দূরে কোথাও, বা বিদেশে।

বেকারত্ব এক ভয়ঙ্কর সত্য যা সহজে মেনে নেওয়া সম্ভব না। বেকারত্বের জ্বালায় গ্রাম থেকে মানুষ শহরে পাড়ি দেয় যাতে তার পরিবারের সদস্যরা দুমুঠো অন্ন মুখে তুলতে পারে। পরিযায়ী পাখিদের মতো শ্রমিকেরা 'বেকারত্ব' শব্দটি জীবন থেকে মুছে ফেলতে ভিনদেশে পাড়ি দেয়।

এর কি কোন প্রতিকার আছে? যদি থেকে থাকে তবে তার ব্যবস্থা শীঘ্রই করা উচিৎ । আমরা প্রত্যেকে হয়তো প্রতিকারের উপায়, উপাদান বলে দিতে পারি কিন্তু প্রতিকার করে দিতে পারি না; সেই সব মানুষের কষ্টগুলোকেও মুছে দিতে পারি না, তাও উপায়টি বলে যাই এই যদি কখনো আমূল পরিবর্তন আসে আর, একটা উপায় কাজে লেগে যায়—

১) প্রচুর পরিমাণে নিয়োগ
২) ভাতা প্রদান বন্ধ (বয়স্ক ও অন্যান্য ভাতা প্রযোজ্য নয় এতে)
৩) শিল্পোন্নয়নের পরিকল্পনা
৪) স্বনিযুক্তির ব্যবস্থা করা
৫) কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি সাধন

পরিশেষে বলা যায়, আজকের দিনে তথা আধুনিক যুগে দাঁড়িয়ে বেকারত্ব এক অভিশাপ যা তিলে তিলে মানুষের মনুষ্যত্বকে গ্রাস করে নেয়। অপরাধ, আত্মহত্যা, মানসিক রোগের শিকার হতে হয় ওই সকল বেকার কর্মহীন শিক্ষিত মানুষকে । যা আগামী প্রজন্মকে

কলুষিত করে দিতে পারে। তাই সকলকে একত্রিত হয়ে, এর তীব্র বিরোধিতা করে, বেকারত্বকে ঘুচিয়ে জনসমাজকে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে হবে। যাতে শিক্ষিত মানুষ তার শিক্ষাকে অসম্মান না করে সম্মান করে ও সমাজের হিত সাধনের উদ্দেশ্যে কাজ করতে পারে।

নূতন ফলগ্রে
কিছু শিখবো, কিছু লিখবো

নববৃন্দাবন নাটকের উদ্দেশ্যমূলকতা ও কাল প্রসঙ্গ

অশোক বর্মণ
প্রাক্তন ছাত্র, বাংলা বিভাগ, দিনহাটা মহাবিদ্যালয়
স্নাতকোত্তর, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়

চিরঞ্জীব শর্ম্মা কর্তৃক রচিত 'নববৃন্দাবন অর্থাৎ ধর্মসমন্বয় নাটক' – টির তৃতীয় সংস্করণ কোচবিহার রাজকীয় যন্ত্রালয়ে রাজকীয় সাহায্যে মুদ্রিত হয় ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে। সময়ের দিক থেকে শতবর্ষ পার করে এলেও পাঠক মহলে কিংবা সমালোচক মহলে তেমনভাবে চর্চা করতে দেখা যায় না এই নাটক সম্পর্কে।

চিরঞ্জীব শর্ম্মার প্রকৃত নাম ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে নবদ্বীপের চকপঞ্চানন গ্রামে তাঁর জন্ম হয় এবং তিনি মারা যান ১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। চিরঞ্জীব শর্ম্মা নামটি তাঁর ছদ্মনাম। কেশব চন্দ্র সেন তাঁকে এই নাম দেন। 'নববৃন্দাবন' নাটকটি ছাড়াও তাঁর রচনার মধ্যে রয়েছে – 'ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা' ও 'কলিসংহার' নাটক।

চিরঞ্জীব শর্ম্মার 'নববৃন্দাবন' নাটকটি একটি উদ্দেশ্যমূলক রচনা। মূলত ধর্ম প্রচারের জন্য এই নাটকটি রচনা করেছেন নাট্যকার। তবে এ বিষয়টি আমাদের কাছে নতুন কিছু নয় । কেননা মধ্যযুগের আবহেও আমরা ঠিক এমনই বিষয় লক্ষ্য করি। সেখানেও দেখা যায় ধর্ম প্রচারের জন্য নয়তো দেবস্তুতি কিংবা দেবতার আদেশ পালন করার জন্য মঙ্গলকাব্য কিংবা অনুবাদ কাব্য গুলি রচিত হয়েছে। মধ্যযুগের সেই আবহকেই কাটিয়ে এসে পাশ্চাত্য প্রভাব ও পাশ্চাত্য ভাবধারা অনুসরণের মধ্য দিয়ে আমরা আধুনিক যুগে পদার্পণ করেছি। কিন্তু তবুও আমাদের মধ্যে নীতিধর্ম লোপ পায়নি, মনুষ্যত্ব লোভ পায়নি, হ্রাস পায়নি ধর্মীয় চেতনা। শুধুমাত্র একটি ভাবধারা থেকে সরে এসে অপর একটি ভাবধারায় বাঁচতে শিখেছি, যার মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে মানুষ।

১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধ এবং সেই যুদ্ধের ফলশ্রুতির মধ্য দিয়ে এদেশে ব্রিটিশদের গোরা পত্তন। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে তাদের শাখা প্রশাখা বিস্তার এবং সেই বিস্তারের মধ্য দিয়ে একটি বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন। দীর্ঘকাল এদেশে তাদের অবস্থান হেতু দেশীয় কিছু সংখ্যক লোক ব্রিটিশদের চলনচালন, শখ-আহ্লাদ, জীবনযাপনের প্রতি ঝুঁকে পড়তে থাকে ও তাদের অনুসরণ করতে থাকে। সেই অনুসরণ করতে গিয়ে কিছুসংখ্যক দেশীয় লোক তাদের নিজস্ব ধর্মীয় চিন্তা, চেতনা, ভাবনা, নৈতিকতা প্রভৃতি থেকে সরে আসতে শুরু করে। তখনই সেই ব্যক্তিবর্গ কে মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য, তাদের মধ্যে ধর্মভাব স্থাপনের জন্য নানা রকম প্রচেষ্টা ও প্রয়াসের প্রয়োজন পড়েছিল। চিরঞ্জীব শর্ম্মার নববৃন্দাবন অর্থাৎ ধর্মসমন্বয় নাটকটি তেমনই একটি প্রয়াস বা প্রচেষ্টা।

'নববৃন্দাবন' নাটকটির কাহিনি আবর্তিত হয়েছে প্রধান চরিত্র অবিনাশ ও তাঁর পরিবার এবং পরিবারের সদস্যদেরকে কেন্দ্র করে। পেশাগত দিক থেকে অবিনাশ উকিল। লোকেদের উস্কানি দিয়ে, কোর্টকাচারি করে, ছলচাতুরি করে কালোকে সাদা আর সাদা কে কালো করে দেখানো তাঁর কর্ম-বৈশিষ্ট্য। সে নাস্তিক, ধর্ম মানে না, মাতাল, অসৎ সঙ্গে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনে যেসব ব্যক্তি ঠিক সেরকমই একজন। এই অবিনাশের জন্য তাঁর বাবা নরহরি বসু, মা অলকাসুন্দরী ও ভাই হরিসুখ ও স্ত্রী চারুশীলা — সকলেই চিন্তাগ্রস্থ। নাটকের কাহিনি যত এগিয়ে যেতে থাকে অবিনাশের চারিত্রিক ত্রুটি এবং অবনতি তত বৃদ্ধি পেতে থাকে। পারিবারিক অশান্তির ভয়ে নেশা থেকে বিরত থাকার প্রতিশ্রুতি দিলেও সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে সে পারে না।

পরবর্তীতে দেখা যায়, অবিনাশ তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে প্ররোচনা করে রতু বসাকের ছেলেকে ওষুধ বলে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে এবং রতু বসাকের স্ত্রীকে হরিদ্বারে পাঠিয়ে তাদের সম্পত্তি নিজেদের নামে লিখে নেয়। ঘটনাটি জানাজানি হওয়ার ফলে তারা শাস্তির ভয়ে আত্মগোপন করে থাকার চেষ্টা করে। অন্যদিকে ছাত্রদের ধর্ম জ্ঞান দান করায় এবং ব্রিটিশ সরকারের রাজ্যে তা নীতির বিরুদ্ধ হওয়ায় অবিনাশের ভাই হরিসুখের চাকরি চলে যায়। ছেলেদের এমন পরিণতি দেখে বাবা নরহরি বসুর অনুশোচনা হয়। তিনি আক্ষেপ করতে থাকেন পূর্বপুরুষের সূত্রে পাওয়া মান সম্মান ও মর্যাদা হানির কথা ভেবে। এরপর যখন অবিনাশ পুলিশের কাছে ধরা পড়ে তখনই তাঁর পরিবারের উপর ট্রাজেডি নেমে আসে। অবিনাশ নিজের কৃতকর্মের জন্য কান্নায় ভেঙে পড়ে। অবিনাশের মা ঘটনা সহ্য করতে না পেরে অচেতন হয়ে পড়ে। হাজতবাসের জন্য অবিনাশকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় আন্দামানে।

কিছু শিখবো, কিছু লিখবো

এই ঘটনার পরে পরেই চারুর কোলের সন্তান ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে মারা যায়। স্বামী ও সন্তান শোকে চারু পাগলিনী হয়ে যায়। তখন তাদেরকে সামলানোর জন্য হরিসুখ এগিয়ে আসে। ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস, আস্থা না থাকার জন্য নিজের এই পরিণতি হয়েছে বলে মনে করে অবিনাশ জেলের মধ্যে আক্ষেপ ও অনুশোচনা করতে থাকে। তাঁর পরিবার না খেতে পাওয়ার অবস্থায় পৌঁছালে চারুর ভাই মহানন্দ ঘোষ এগিয়ে আসে। জেলের মধ্যে থাকতে থাকতে অবিনাশের মধ্যেও পরিবর্তন চলে আসে, তাঁর মধ্যে সদ্ভাবের উদ্ভব হয়। ঈশ্বরের প্রতি তাঁর বিশ্বাস, ভক্তি জেগে ওঠে এবং সমস্ত রকমের অপকর্ম থেকে বিরত থাকার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে। ফলত তাঁর আচরণ ও শান্ত ভাবের দ্বারা খুশি হয়ে সম্রাটের জন্মদিনের দিন তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং সে বাড়ি ফিরে আসে। তাঁর পরিবারের সদস্যরাও খুশি হয়ে ঈশ্বরের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে। কিন্তু ততদিনে অবিনাশের উপলদ্ধি অনেক উঁচুতে স্থান নিয়েছে। তাই স্ত্রী চারুকে সঙ্গে নিয়ে সংসার ত্যাগ করে সদগুরুর খোঁজে, ঈশ্বরকে উপলদ্ধি করার পথের খোঁজে সে বেরিয়ে পরে। তাঁদের খোঁজ তাঁদের কে নিয়ে যায় নীলগিরি পর্বতে, সেখানে উপস্থিত অভেদানন্দ যোগীর কাছে উপদেশ ও পথনির্দেশ জানতে চায়। তখন যোগী অভেদানন্দ তাঁদেরকে সংসারের মধ্যে আবদ্ধ থেকেই ঈশ্বরের সাধনা করতে বলেন। তিনি জানান,

ইশ্বর নিরাকার,সর্বত্র বিরাজমান, সংসারের মধ্যে আবদ্ধ থেকেও তাঁকে পাওয়া যায়।

নাটকটির কাহিনি পরিসরগত দিক থেকে খুব বেশি বড়ো না হলেও কালগত, সমাজগত ও ব্যক্তির চিন্তা-ভাবনাগত নানা প্রসঙ্গ এর মধ্যে উঠে এসেছে। নাটকটি ব্রিটিশ শাসনকালে রচিত। ফলে ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব এই নাটকে পড়েছে। নাটকটিতে এমন একাধিক চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, যারা ব্রিটিশ চালচলন এবং স্বভাবের প্রতি ঝুঁকে পড়তে, তাদেরকে অনুসরণ করতে অভ্যস্থ। সে বিষয়ে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে –

i. " আমার তো তাই ইচ্ছে,তিনি যে ছাড়েন না।নৈলে কাঁচা গোরুর আধ সেদ্ধ মাস গুলো কি আর ভালো লাগে ? গা যেনো বোমি বোমি করে আসে। এখন তবু অনেকটা অভ্যেস হয়ে এসেছে।"১

ii. " সাহেবদের অনুকরণ কত্তে গিয়ে এইটী হল। উপায়ত কিছু দিখি নে। ওদেরই বা দোষ কি ? ওরা যদি মদের দোকান বন্ধ করে বাবুরা হয়তো তা হলে কেঁদে মরবে।"২

কিছু শিখবো, কিছু লিখবো

iii. " ছোট লোক ব্যাটারা দুপাত ইংরিজি পড়ে পৃথিবী যেন সরাখানা দেখে। ধর্ম্ম আছে বলে কি মনে একটু ভয়ও হয় না? হায়! কি ঘোর কলি উপস্থিত।"৩

একটা সময় ছিল যখন মানুষ দৈবনির্ভরতা কাটিয়ে পাশ্চাত্য প্রভাব ও পাশ্চাত্য ভাবনায় নিজেদের বিচার করতে চেয়েছিল, চেয়েছিল আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু এই আত্মপ্রতিষ্ঠার নাম করে একদল মানুষ যোগদান করেছিলো স্বেচ্ছাচারীতায়। অবিনাশ, বলরাম কবিরত্ন, ভোলা মাতাল চরিত্র গুলি সেই ধরনের মানুষ। তবে এই সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, স্বভাব যে এই নাটকে প্রথম দেখা গেলো – এমন টা নয়। মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা' নামক প্রহসনেও এইরূপ চরিত্র ও বিষয়ের উপস্থাপন করা হয়েছে।'ইয়ংবেঙ্গল' এর প্রভাবে চরিত্রের অবনতি লক্ষ্য করা যায় সেখানেও।

কিন্তু কেবলমাত্র চরিত্রের অবনতি কিংবা চরিত্রের অপকর্ম কে তুলে ধরা

'নববৃন্দাবন' নাটকের উদ্দেশ্য নয়। চরিত্রকে একটি উচ্চতর আসনে অধিষ্ঠিত করে তার মধ্যে দোষ, গুণ, ত্রুটি আবিষ্কার করে অপকর্ম কে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে চরিত্রের অবনতি দেখানো এবং সেই অপকর্মের ফলশ্রুতির দ্বারা চরিত্রের মধ্যে আক্ষেপ, অনুতাপ ও অনুশোচনার সৃষ্টি করা। অর্থাৎ চরিত্রকে সৎ পথের দিশা দেখানো, নাস্তিক ও অনৈতিক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তির মধ্যে ধর্মভাব, ঈশ্বর ও নৈতিকতার বীজ বপন করা। আর এই বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নাটকটিতে তিন ধরণের চরিত্র সৃষ্টি করেছেন নাট্যকার – ক) নাস্তিক, খ) আস্তিক, ও গ) উপদেষ্টা। এই তিন ধরণের চরিত্রগুলিকে আলাদা আলাদাভাবে দেখানো হয়েছে নাটকে। নাস্তিক চরিত্র গুলিকে নানা ঋণাত্মক দিকের সমন্বয়ে তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি এও দেখানো হয়েছে ধর্ম, নৈতিকতা এবং ইশ্বরের প্রতি বিশ্বাস না থাকলে জীবন কতটা অচল, কতটা অসহায় হয়ে পড়ে। কিন্তু আস্তিক চরিত্র গুলিকে দেখানো হয়েছে একটু স্বতন্ত্রভাবে। জীবন থাকলে সমস্যা থাকবে, সমস্যা থাকলে সমাধানের উপায়ও থাকবে – এই ভাবনাটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে আস্তিক চরিত্রের মধ্যে। তাই দেখা যায় আস্তিক চরিত্র সকলের ধর্ম, নৈতিকতা, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা থাকায় তারা সব বাঁধা পেরিয়ে যায়,নাস্তিকদের মতো বিপর্যস্ত হতে হয় না তাদের। আর এই দুই ধরণের চরিত্র-ব্যক্তিকে মূল পথের সন্ধান দেওয়ার জন্য এবং তাদেরকে সৎপথে প্রবৃত্ত থাকার উপদেশ দেওয়ার জন্য এসেছে যোগী অভেদানন্দের মতো উপদেষ্টা চরিত্র।

অবিনাশের মধ্যে যে পরিবর্তন, চেতনার যে জাগরণ ঘটে – তা কিন্তু একটি উদ্দেশ্যের প্রতি ইঙ্গিত করে। নাটকটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে পালাবদল ঘটতে দেখা যায় – তা কোথাও না কোথাও আমাদেরকে সেই প্রত্যয়েই প্রত্যয়ী করে তোলে। শুধু তাই নয়,সময় ও সমাজকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে নাটকটি যে ভূমিকা পালন করে সেটিও কোনোভাবে অস্বীকার করা যায় না। আসলে সকল মানুষই যে সময়ের চক্রে বাঁধা, সমাজের শিকলে বাঁধা এক একটি অঙ্গস্বরূপ – তা অবিনাশ থেকে শুরু করে চারু,হরিসুখ প্রমুখ সকলের দ্বারা প্রমাণিত হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের পরিবর্তন ও উপলব্ধিই তাঁদেরকে নবজাতকে রূপান্তরিত করে,পরিণত করে বিবেকীতে।

তথ্যসূত্রঃ

১) দাস রুম্পা, দাস জয়, শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মকর্ত্তৃক বিরচিত নববৃন্দাবন অর্থাৎ ধর্মসমন্বয় নাটক, প্রথম পাড়ি প্রকাশ – সেপ্টেম্বর ২০২০, পৃ – ৪০ ।

২) তদেব, পৃ – ৫৫ ।

৩) তদেব, পৃ – ৩২ ।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্প : সমাজ ও বৈধব্য জীবন

মধুমিতা ঘোষ
প্রাক্তন ছাত্রী, বাংলা বিভাগ, দিনহাটা মহাবিদ্যালয়
স্নাতকোত্তর, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

"১৯৪১ থেকে ১৯৫০ এই ১০ বছরেই বাংলা ও বাঙালির জন্মান্তর হয়েছে । এই সময়ে যারা ছোটগল্পের আসরে দেখা দিয়েছিলেন তাদের জন্ম ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে । তাঁরা যখন তারুণ্যে পদার্পণ করেন তখনই বঙ্গদেশের পালে বিপর্যয় আর অবক্ষয়ের হাওয়া লেগেছে । সেই হাওয়া ঝোড়ো হাওয়ায় পরিণত হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্ব সমরের অন্তিম পর্বে । তখনই এই লেখকরা ২২ -২৩ বছরের তরুণ । ভারসাম্যের বিচলন, মূল্যবোধের বিনষ্টি, সুস্থ জীবন বোধের অবসান, অবক্ষয়ের প্রতিষ্ঠা, বিপর্যয়ের বিজয়, স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে বাংলার অর্থনৈতিক রাজনৈতিক মহিমার অবসান : এই পটভূমিতে আলোচ্যমান লেখকেরা চোখ মেলে তাকিয়েছেন , দেখেছেন ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি, অবাক মেনেছেন ভাগ্যের পদাঘাতে। এই গোষ্ঠীভুক্ত লেখকেরা হলেন- নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায় , নব্যেন্দু ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষ কুমার ঘোষ ,বিমল কর, সমরেশ বসু, রমাপদ চৌধুরী।"১

বাংলা সাহিত্যে নরেন্দ্রনাথ মিত্র এক অমর ব্যক্তিত্ব । ১৩২৩ সালে ১৬ই মাঘ (১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে ৩০শে জানুয়ারি) অবিভক্ত বাংলার (বর্তমান বাংলাদেশ) ফরিদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন । পিতা মহেন্দ্রনাথ মিত্র ও মাতা বিরাজ বালা দেবী ।পিতার থেকেই নরেন্দ্রনাথ মিত্র সাহিত্যে অনুরাগী হয়ে ওঠেন । শান্ত স্বভাবের কর্মভোলা এই মানুষটির হাতে আধুনিক ছোটগল্প বিচিত্র রূপে আত্মপ্রকাশ করে । তবে আধুনিক ছোটগল্প জন্ম যে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের হাতে হয়েছে, তা নয় । আধুনিক ছোট গল্প বলতে আমরা যা বুঝি তার উদ্ভব হলো ১৯ শতকে এসে রুশ সাহিত্যিক নিকোলাই গোগোল ও মার্কিন লেখক এডগার অ্যালেন পো'র হাতেই আধুনিক ছোট গল্পের বাস্তবসম্মত শিল্পরূপ গড়ে ওঠে । পাশ্চাত্য সাহিত্য ছোটগল্পের প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় তার গতি , আর এই গতিপথকে আরো মসৃণ করেছিলেন আন্তন চেকভ , গী-দ্য-মোপাসাঁ, মাক্সিম গোর্কি , আলফঁজ দোদে প্রমুখ । তবে পাশ্চাত্য দেশের পাশাপাশি এদেশেও ছোট গল্প লেখা হয়েছে । বাংলা সাহিত্যে প্রথম ছোট গল্প বলে পরিচিত যে কাহিনী সেটি হল শ্রী পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মধুমতি'। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শন পত্রিকায় । যদিও এই কাহিনীর মধ্যে উপন্যাসের লক্ষণ বর্তমান । তবে বাংলা সাহিত্যে আধুনিক ছোট গল্পের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । রবীন্দ্রনাথের হাতেই ছোট গল্পের জন্ম যৌবন এবং পরিনতি। ছোটগল্প ধারায় প্রায় রবীন্দ্র সমকালে উঠে এলেন নগেন্দ্র গুপ্ত, রবীন্দ্রনুপ্রাণিত গল্প লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গল্পকার হলেন- সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ,অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, মনিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সরলা দেবী, ইন্দিরা দেবী, নিরুপমা দেবী প্রমুখ । বঙালির জীবনসমস্যা ,সমাজ জীবনের মূল্যবোধ তুলে এনেছেন শরৎচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়ের তাঁর লেখায় । হাসির খোরাক গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন শিবরাম চক্রবর্তী,ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখরা। অন্যদিকে কল্লোল গোষ্ঠীর মাধ্যমে চিন্তা চেতনায় বিকাশ ঘটিয়ে ছোটগল্প সাহিত্য পরিণতির পথ অগ্রসর করেছেন প্রমথ চৌধুরী ,মনীন্দ্রনাথ বসু, গোকুল নাগ ও আরো অনেকে । ত্রিশের দশকে এসে জগদীশ গুপ্ত , পাতালপুরীর মানুষদের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা তুলে ধরলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। এছাড়া বাংলা সাহিত্যে তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাদের লেখায় ভিন্ন স্বাদ বয়ে আনলেন । আসলে সাহিত্যের গতিপথ তো অবাধ ও অগাধ , সময়ে সময়ে বাঁধভাঙ্গা নিয়মে পলি জমিয়ে উর্বর হয়ে উঠেছে ছোটগল্প রূপ নদী । এভাবে বাংলা সাহিত্যে আধুনিক ছোট গল্প ধীরে ধীরে বহু লেখকের হাতে স্পর্শ করে এগিয়ে চলল । ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ , এই যুদ্ধের পরবর্তী অধ্যায়ে বিচিত্র জীবন স্পন্দনের অভিজ্ঞতাকে চেতনার আলোকে তুলে ধরলেন কিছু লেখকেরা। তারা জীবনকে দেখলেন বুদ্ধি অনুভূতির যুগ্ম-চেতনা দিয়ে । সামাজিক ,অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে ব্যক্তি মানুষের সমবেদনা কে তারা অনুরণিত করে তুলেছেন । এই ধারার লেখকদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ মিত্র অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন । আসলে মানুষের জীবন তো অসংখ্য তরঙ্গে পূর্ণ। এক একটি তরঙ্গে জীবনের একেকটি দিককে উদ্ভাসিত করা যায় । উদ্ভাসিত হওয়া অংশটুকুই নরেন্দ্রনাথ মিত্র ছোটগল্পে ধরে রেখেছেন । তাই তাঁর গল্পে যেমন আছে জীবনের দুঃখ ,বেদনা ,রুদ্রতা তেমনি আছে কোমল, শান্ত ও আনন্দঘন মুহূর্ত । কল্পনা করেছেন ঠিকই তবে বাস্তব কে কখনো ত্যাগ করেননি । বিভিন্ন ধরনের বিষয় নিয়ে তিঁনি ছোটগল্প সাহিত্যে সম্পদের কলেবর সৃষ্টি করেছেন ।

একজন লেখকের লেখার বিভিন্ন আঙ্গিক হয়তো ধরা সম্ভব নয়, কিংবা কথাকে ধরা গেলেও অনুভবকে ধরা অসম্ভব । আমার লেখবার বা বলবার বিষয় মূলত - 'নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্পে সমাজ ও বৈধব্য জীবন'। এবার প্রশ্ন উঠতেই পারে ,তাহলে ছোটগল্পের উদ্ভব সম্পর্কে এতখানি ভনিতা কেন ? উত্তরে বারবার আমি বিশ্বাস করি মগডাল চেনার আগে শেকড় চেনাটা জরুরী। আবার এরকমটাও মনে হতেই পারে ' প্রসঙ্গ 'বিধবা !' এ আবার নতুন কি বিষয় ? এর আগেও তো অনেক গল্পকারই বিধবাদের নিয়ে বহু গল্প/ কাহিনী লিখেছেন । কিন্তু...

স্বামী মারা যাবার পর স্ত্রী রা বিধবা বলে সমাজে বিবেচিত হয় । এ দেশের সমাজে বিধবাদের দ্বিতীয়বার বিয়ের করার অধিকার থাকে না । যদিও সমাজ কি কেন এ প্রসঙ্গ বিতর্কিত । আমি/আপনি / আমাদের নিয়ে কিছু একটা হয়তো 'সমাজ' ! কিন্তু তথাকথিত প্রচলিত শব্দ 'সমাজ' ও 'সমাজের নিয়ম' । কিন্তু মন বলে যে বস্তু আছে তা কখনোই সমাজের চোখে ধরা পড়ে না । তাই বিধবাদের প্রেম সমাজ নিষিদ্ধ প্রেম বলেই দাগিয়ে দেওয়া হয়। এদেশে এমন দৃষ্টান্তও আছে যে, বিধবাদের স্বামীর চিতার সঙ্গে জ্বলন্ত অবস্থাতেই পুড়িয়ে মারা হত । সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'সহমরণ' কবিতাটি তার জ্বলন্ত উদাহরণ ।পরবর্তীতে রাজা রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় এসব রীতি আইন সিদ্ধ

নয় বলে গণ্য হয়। এককালে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যেও বিধবাদের প্রেমকে দেখানো হয়েছে ঠিকই ,কিন্তু সে প্রেম প্রেমিকার মনেই থেকে গেছে কখনো প্রকাশিত হয়নি। সমাজের ভয়ে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে বিধবাদের প্রেমকে গুমড়ে কাঁদতে দেখা গেছে । কিন্তু নরেন্দ্রনাথ বিধবাদের প্রেমকে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন । তিনি বিধবাদের বিয়ে দিয়েছেন ,সুখে শান্তিতে ঘর করিয়েছেন। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের লেখা 'বিধবা প্রসঙ্গের 'গল্পগুলি বিশ্লেষণ করলে তার প্রমান মেলে ।

তাঁর 'মহাশ্বেতা' নামক গল্পে দেখি চিন্মহোন বিধবা অমিতাকে হিন্দু নিয়ম মেনে বিয়ে করেছে। স্বামীর মৃত্যুর পর অমিতা পাঁচ বছর বৈধব্য জীবন কাটিয়েছে। বৈধব্য জীবন কাটালেও বিষয়টা সে মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। সমাজের চাপে পড়ে সে বৈধব্য বেশ ধারণ করতে বাধ্য হয়েছে । মনে মনে সে চিন্মহোনকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতো । তাই চিন্মহোন নানা সংস্কার , বাধা কাটিয়ে অমিতাকে বিয়ে করেছে । তখন অমিতার নতুন নাম হয়েছে মহাশ্বেতা । বর্তমান প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় একজন অবিবাহিত রমণী বিপত্নীক পুরুষকে বিয়ে করলে সমাজ তেমন বাধা দেয় না কিন্তু উল্টো ব্যাপার অর্থাৎ স্বামীত্যাগী পত্নীকে কিংবা বিধবা কোন রমণীকে বিয়ে করলে চলে আসে নানা সংস্কার, কারণ এই সমাজ মেনে নেয় না ।তাই অমিতা -চিন্মহোনের বিয়েটাও কেউ ভালো দৃষ্টিতে গ্রহণ করেনি । অবশ্য চিন্মহোন জানে - 'বর্তমান যুগে বিবাহটা ব্যক্তিগত ,পরিবারগত নয় '। ব্যক্তি হিসেবে চিন্মহোন ও অমিতা বিয়ে টাকে মনেপ্রাণে মেনে নিয়েছে । তাদের কাছে সংস্কার বা সমাজের চাপ পরাজিত হয়েছে , বড় হয়ে উঠেছে সৎ মানসিকতা ।

আর্থিক ক্লিষ্টতার একটি গল্প 'শাল' । এখানে বিজয় ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ায় মারা গেলে বীথিকা একা হয়ে পড়ে । একাকীত্ব মোচনের জন্য সে অনিমেষকে বিয়ে করল । অবশ্য অনিমেষও তাকে বিয়ে করেছে সচেতন হয়েই । পরস্পরকে ভালোবেসেছে নতুন করে ঘর বেঁধেছে তারা । বীথিকা নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখেছে, বিজয়ের মৃত্যুতে সে ভেঙে পড়লেও অনিমেষকে পেয়ে নিজেকে সামলে নিয়েছে । অনিমেষও বীথিকাকে বিধবা বলে ঘৃণা করেনি। স্ত্রীর পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছে ।

' স্বামীকে দেখে মাথায় অল্প একটু আঁচল তুলে দিয়েছে বীথিকা । ফিকে হলদে রঙের আঁচল । খুব ফর্সা রং বীথিকার । ফলে যে কোন রঙের শাড়ি ওকে মানায় । তবু শাড়ি কিনতে গিয়ে রং বাছাই করতে অনেক সময় নেয়। অনিমেষ । এক রঙের পর আর এক রং । কোনদিন ভুলেও আনে না কালো পাড় কি সাদা খোলের শাড়ি।' সুতরাং তার মনে প্রানে একে অপরকে মানিয়ে নিতে পেরেছে । তবে একটি 'শাল'কে কেন্দ্র করে বীথিকার মনে অশান্তির সৃষ্টি হলেও অনিমেষের ভালবাসাতে মনে শান্তি ফিরে পেয়েছে । এই শালটি ছিল বীথিকার আগের স্বামী বিজয়ের স্মৃতি হিসেবে । সে শালটিকে রেখে দিয়েছিল । গল্পটির মধ্যে লেখকের সমাজ সংস্কারের মনোভাব পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্রের মতো তিনি বিধবাদের কাশী বাসী করেননি। বরং বিধবাদের তিনি জীবনের মূল স্রোতে নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করেছেন ।

'ক্রোড়পত্র' বিধবাদের সমস্যা কবলিত নরেন্দ্রনাথ মিত্রের লেখা আরো একটি গল্প । এখানে গল্পের নায়িকা জয়ন্তী বিধবা । তার নিকট সম্পর্কীয়া বলে কেউ নেই । নিজের চেষ্টায় কাজ করে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে সে । নারী কল্যাণ সমিতির ফরিদপুর শাখার সম্পাদিকা সে । এই সমিতিতে নারীদের সমস্যা আলোচনা হয় এমনকি বিধবা নারীদের সমস্যা আলোচিত হয় । কয়েকজন বিধবা রমণীকে এই সমিতি বিয়েও দিয়েছে, কিন্তু জয়ন্তী বিয়ে করতে প্রস্তুত নয় । সে অরুণকে বলেছে -

'যেসব সভ্যরা নতুন করে শাঁখা সিঁদুরের স্বাদ পাচ্ছেন তারা এমন করে ডুবে যাচ্ছেন ঘর সংসারে যে চার আনা চাঁদা পর্যন্ত মিলছে না তাদের কাছ থেকে । সে দশা তো আমারও হতে পারে । তার চেয়ে একেবারে পাকা চুলেই ফের সিঁদুর পরব । দ্বিতীয়বার মুছবার আর ভয় থাকবে না । সমিতির ভিতটাও আশা করি ততদিনে পাকাপোক্ত হবে।'

বিধবা জয়ন্তী সমিতির জন্য প্রাণ ঠেলে দিয়েছে সমিতিতে যে পাকাপোক্তভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চায় । এই ভেবে সে বিয়ে করতে প্রস্তুত না হলেও পরিতোষকে ভালোবেসেছে । যদিও সমাজ সে ভালোবাসার মূল্য দেয়নি । ঠাকুরদা বলেছে-

' আরে মশাই বিয়ে কার জানেন ? বিধবার । বিয়ের চুড়োয়, কোন শুভ কাজে সে হাতছোঁয়ালে মহাভারত পর্যন্ত অশুদ্ধ হয়ে যায়, অধিবাস -টাস নয় তার একেবারে সাক্ষাৎ বিয়ে! বলুন দেখি কি কান্ড! গোড়াতেই অযাত্রা । মিষ্টিমুখ নয় মিষ্টি কথা শুনে এ যাত্রা বিদায় নিতে হবে ।.. অরুণ একটু বিস্মিত হয়ে বলল -'পরিতোষ কি বিধবা বিয়ে করেছে নাকি ?...' এই হল বিধবা বিবাহ সম্পর্কে সমাজের মনোভাব । তবুও এইসব বাধা বিপত্তি কাটিয়ে পরিতোষ জয়ন্তীকে বিয়ে করতে প্রস্তুত হয়েছে। এখানে নরেন্দ্রনাথ মিত্র বিধবার প্রতি দয়া দেখাননি ,প্রতিষ্ঠা করেছেন বিধবার অধিকারের কথা ।

বিধবা মেয়েদের আবার ভালোবেসে বিয়ে করে নতুন করে সম্পর্ক গড়ে তোলা যায় নাকি ? হ্যাঁ যায় । 'স্বত্ব' গল্পে প্রতুল বন্ধু পত্নী বিধবা মানসীকে বিয়ে করে ঘরে এনেছে । সঙ্গে এনেছে মানসীর দুই বছরের ছেলেকে । পুতুলের এই কাজে মা সুভাষিনী সন্তুষ্ট হতে পারেননি। অবশ্য প্রতুল এই জন্য প্রস্তুত ছিল । বিধবা মানসীকে বিয়ে করলে মা মেনে নেবে না মনে মনে এই সমস্যার জন্য তৈরিই ছিল প্রতুল ।বাস্তবিক তাই হয়েছিল । মা ক্রুদ্ধ হয়ে এক আত্মীয়ের বাড়ি চলে গিয়েছিল । কিন্তু সম্মান রক্ষার জন্য আবার ছেলে বৌমার সংসারে ফিরে এসেছে । এসে তাদের সঙ্গে মানিয়ে চলছে । এমনকি মানসী ও প্রতুলের তিনবছর পর প্রথম বিবাহ বার্ষিকীতে সুভাষিনী মানসীর ছেলেকে আপন করে নিয়েছে ।

'পুনর্ভবা' সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে রচিত গল্প হলেও এখানেও বিধবার জীবন প্রতিষ্ঠা কাহিনী ফুটে উঠেছে । সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সুকৃতির স্বামী বিমল বাবু মারা যায় । সুকৃতি এখন বিধবা । সুকৃতির শশুর, পুত্রবধূর বৈধব্য অবস্থা মেনে নিতে রাজি না তাই তিনি নিজেই শেখরের সঙ্গে বিধবা পুত্রবধূকে বিয়ে দিলেন কিন্তু সুকৃতির রক্তের সম্পর্কের পিতা এতে মত দিতে পারলেন না। তিনি বলেছেন—

' আপনার আচরণ আমার ভালো লাগছে না বেয়াই ,ওর কপালে যা ছিল হয়েছে । দুদিনের জন্য হলেও সুখ শান্তি স্বাদ ও পেয়েছি । আমার বিধবা মেয়ের বিয়ে না দিয়ে যদি ওর আইবুড়ো বোনগুলির একটা ব্যবস্থা করতেন আমার অনেক উপকার হত ।'

কিন্তু সুকৃতির শশুর আপন কন্যা ও পুত্রবধূকে সমান দৃষ্টিতে দেখতেন । তাই তিনি সুকৃতিকে আপন মেয়ে মনে করে বিয়ে দিয়েছেন এবং বলেছেন -'গায়িত্রী আর সুকৃতিকে আমি তো আলাদা করে দেখিনি শেখর '।

অন্যদিকে বিধবা মেয়েদের স্বাবলম্বী করে তোলার গল্প 'সুদ' । বিধবা মেয়েদের একান্নবর্তী পরিবারে থাকা বেশ নিরাপদের এ কথা প্রায়ই আমরা সকলেই মেনে নিই । কিন্তু সেই বিধবা মেয়ের হৃদয় রাজ্যের কথা আমরা সহজে মেনে নিতে পারি না । তাকে স্ত্রী হিসেবে মর্যাদা দিতে নারাজ এখনকার সমাজ । কিন্তু নরেন্দ্রনাথ মিত্র বিধবাদের এই কষ্টকর জীবনটাকে মেনে নিতে পারেননি । তাই তিনি বিধবাদের আবার বিয়ে দিয়েছেন কিংবা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করেছেন। লেখক এই গল্পে পঞ্চানন বাবুর মুখ দিয়ে তাই এ কথাই বলিয়েছেন যে - ' সেদিন আর নেই মশাই । দেওর ভাসুর বিধবা ভাইবউকে পুষবে, সেদিন আর নেই। এখন যার যার তার তার । একজন বিহনে সব অন্ধকার। পথের ভিখিরী । আজকালকার মেয়েরা যে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে ,খুব ভালো মশাই, খুব ভালো। আমি খুব পছন্দ করি ।'

আবার 'যবনিকা' গল্প দেখি অনিতা তার সন্তানকে ভালোবাসে আবার এক ডাক্তারকেও ভালোবেসে বিয়ে করতে চায়। নানা বাধা বিপত্তি কাটিয়ে বিয়েও করেছে । ডাক্তারের সঙ্গে তার পরিচয় ছেলের অসুখ নিয়ে। সেই পরিচয় প্রেমে রূপান্তরিত হয়েছে ।' ছেলের অসুখ ছেড়ে গেছে, কিন্তু ডাক্তার গেল না।' এই না যাওয়ার মধ্যে প্রমাণ করে যে সে ডাক্তারকে ভালোবেসে নতুন জীবনের আশা করেছিল । অনিতা বুঝেছিল বৈধব্য জীবন নয়, জীবনকে ভোগ করতে হলে বিধবা বেশ ত্যাগ করতে হবে । তাই সে বিধবা বেশ ত্যাগ করে ডাক্তারের স্ত্রী হয়েছে । মাতৃত্বের সাথে সাথে বরণ করেছে সাংসারিক দাম্পত্য জীবন ।

বিধবাদের গল্প হিসেবে শ্রেণীবিভাগ করলেও, মূলত বিধবা সমস্যা সমাজেরই সমস্যা । তাই ব্যাপক অর্থে বিধবা সমস্যা সমাজসমস্যারই অন্তর্গত । তবুও বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে বিধবারা সমাজের মূল স্রোতে মিশতে পারে না , সমাজব্যবস্থা বাধা সৃষ্টি করে । নরেন্দ্রনাথ মিত্র ছিলেন এই ব্যবস্থার বিরোধী । তাই তিনি বিধবাদের সমাজের প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য আবার বিয়ে দিয়েছেন । অমিতা (মহাশ্বেতা), বীথিকা (শাল), জয়ন্তী (ক্রোড়পত্র), মানসী (স্বত্ব), সুকৃতি (পুনর্ভবা) এরা সকলেই বিধবা ,আবার বিয়ে করে সুখে সংসার করছে।তিনি এদের মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন বৈধব্য কোনো ব্যাধি নয় , সমাজের বুকে চেপে বসে কুসংস্কারমাত্র - চাইলেই এর উত্তরণ সম্ভব । নরেন্দ্রনাথ মিত্র গল্পে শুধু যে বিধবাদের বিয়ে দিয়ে সুখী সংসার দেখিয়েছেন তাই-ই নয় , বিধবাদের স্বাবলম্বী করে সমাজে প্রতিষ্ঠিতও করে তুলেছেন । এ প্রসঙ্গে মনে আসে বিদ্যাসাগরের কথা । তিঁনি তাঁর পুত্রকে এক বিধবা রমনীর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেখিয়েছিলেন বিধবা বিবাহ

কোন অন্যায় কাজ নয় । নরেন্দ্রনাথ মিত্র এই কাজটি করলেন তাঁর সাহিত্যে । তাঁর দৃষ্টি ছিল বিধবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল । আসলে নরেন্দ্রনাথ মিত্র বিশ্বাস করতেন বিধবার বেশে নয় ,সধবার বেশে থাকলে সমাজ সংসার সুন্দর হয় । আর সুন্দর সমাজ সংসার সকলেরই কাম্য।

তথ্যসূত্রঃ

১.মুখোপাধ্যায় ডঃ অরুণকুমার ,কালের পুত্তলিকা ,দেজ পাবলিশার্স,১ ম সংস্করণ ,পৃ : ৩৮৪

গ্রন্থঋণ -

১. মিত্র নরেন্দ্রনাথ , গল্পমালা ,১ ম খণ্ড ,আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লি , প্রথম সংস্করণ
২. মিত্র নরেন্দ্রনাথ , গল্পমালা , ২য় খণ্ড ,আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লি , প্রথম সংস্করণ
৩. প্রামাণিক ডঃ সঞ্জয় , নরেন্দ্রনাথ মিত্র এবং বাংলা ছোটগল্প ,পুস্তক বিপণি (২৭বেনিয়াটোলা লেন ,কলকাতা-৯), প্রকাশকাল -জুলাই,২০০৪

নূতন কলমে
কিছু শিখবো, কিছু লিখবো

প্রতিবাদের ভিন্ন কাহিনী: ‘সুবর্ণলতা’

কেয়া কর্মকার
প্রাক্তন ছাত্রী, বাংলা বিভাগ, দিনহাটা মহাবিদ্যালয়
স্নাতকোত্তর, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা কথাসাহিত্যের এক বিশিষ্ট নাম আশাপূর্ণা দেবী। কথাসাহিত্যের জগতে তিনি স্ব-মহিমায় ভাস্বর হয়ে রয়েছেন। তিনি ঘরোয়া জীবনের কথাকার। অর্থাৎ যে জগৎটি সাধারণ লোকচক্ষুর আড়ালে থাকে, যে জগৎটির খবর জানে কেবল বাড়ির মেয়েমহল,সেই জগৎটির কথাই নিজের গল্প- উপন্যাসের মধ্য দিয়ে শুনিয়েছেন আশাপূর্ণা দেবী। আর এখানেই বাংলার অন্যান্য কথাসাহিত্যিকদের থেকে তাঁর আসনটি স্বতন্ত্র। নিজের ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই ঘরোয়া জীবনটিকে তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন। দেখেছেন এই চার দেওয়ালের মধ্যে কত বৈচিত্র্যময় জীবন। এই ঘরোয়া জীবনের বিভিন্ন চরিত্রই তাঁর গল্প উপন্যাসের চরিত্র হয়ে উঠেছে। ঔপন্যাসিক ‘যা দেখি, তাই লিখি’ অংশে এই প্রসঙ্গে বলেছেন –

“আমি কখনো আমার জানা জগতের বাইরে কোথাও পা ফেলতে যাই না এবং আমার সেই জগৎটি একেবারে চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তবু তার মধ্যে দেখে চলেছি কি অফুরন্ত জীবন বৈচিত্র্য। কী বিচিত্র সব চরিত্র। যে মানুষের মধ্যে রয়েছে উত্তরণের প্রেরণা, সুকুমার শুভবোধ, সেই মানুষই হয়তো পারিপার্শ্বিকতার চাপে অদ্ভুত একটি বিকৃত চেহারা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যা বাইরে থেকে ঘৃণ্য বিকৃত। কেবলমাত্র নারীপুরুষের সম্পর্কের মধ্যেই নয় পরিবারিক জীবনের অন্যান্য সম্পর্কের মধ্যেও কত টানাপড়েনের,কত ভেজাল নির্ভেজালের কারবার...”১

আসলে লড়াই কেবলমাত্র বাইরের মানুষের সাথেই হয় না, এক ছাদের নীচে থাকা মানুষগুলোর মধ্যেও হয়। এই লড়াই, আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই। প্রশ্ন ওঠে স্বাধীনতার। এই লড়াইয়ে ক্ষত-বিক্ষত হয় মানুষের অন্তর জগৎ। এভাবেই প্রতিনিয়ত নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ের কথাই বলে আশাপূর্ণা দেবীর ‘সুবর্ণলতা’ উপন্যাসের নায়িকা সুবর্ণলতা।

আশাপূর্ণা দেবীর বিখ্যাত ত্রয়ী উপন্যাস – ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’(১৯৬৫), ‘সুবর্ণলতা’(১৯৬৬), ‘বকুল কথা’(১৯৭৩)। ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাসের জন্য তিনি ১৩৭২ সালে রবীন্দ্র-পুরষ্কার এবং ১৩৮৪ সালে জ্ঞানপীঠ পুরষ্কার পেয়েছেন। ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’র সত্যবতী, ‘সুবর্ণলতা’র সুবর্ণলতা এবং ‘বকুল কথা’র বকুলের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক তিনটি কালের কথাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। একই পরিবারের তিন নারী চরিত্রকে কেন্দ্র করে তাদের অন্তঃপুরের সংগ্রামের কথা তিনি শুনিয়েছেন। ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ তে যে আত্মপ্রতিষ্ঠার

লড়াইয়ের সূচনা সুবর্ণলতা হয়ে তা 'বকুল কথা'তে শেষ হয়েছে। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসের শুরুতে ঔপন্যাসিক বলেছেন-

"বহির্বিশ্বের ভাঙাগড়ার কাহিনী নিয়ে রচিত হয় বিগত কালের ইতিহাস।... কিন্তু স্তিমিত অন্তঃপুরের অন্তরালেও কি চলে না ভাঙাগড়ার কাজ? যেখানে থেকে রং বদলে হয় সমাজের, যুগের,সমাজ মানুষের মানসিকতার। চোখ ফেললে দেখা যায় সেখানেও অনেক সঞ্চয়। তবু রচিত ইতিহাসগুলি চিরদিনই এই অন্তঃপুরের ভাঙাগড়ার প্রতি উদাসীন। অন্তঃপুর চিরদিনই অবহেলিত"।২

এই অন্তঃপুরের অবহেলিত নারীর কথাই পাওয়া যায় 'সুবর্ণলতা' উপন্যাসে। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র সত্যবতীর মেয়ে সুবর্ণলতা। মাত্র নয় বছর বয়সে যার বিয়ে হয় মুক্তকেশীর মেজছেলে প্রবোধের সঙ্গে। যার জীবনে বিয়েটাই একটা আকস্মিক ঘটনা। আর সেই বিয়েকে কেন্দ্র করেই সত্যবতীর সংসার জীবন ত্যাগ।সুবর্ণলতাকে সেই গৃহত্যাগিনী মায়ের মেয়ে হওয়ায় মুক্তকেশীর সংসারে আজীবন কথা শুনতে হয়েছে। শুধু কি তাই? সুবর্নলতার মুক্তিকামী মনের জন্যও তাকে প্রতিপদে কথা শুনতে হয়েছে। আজীবন সে চেয়েছে একটু খোলা ছাদ। যেখানে সে প্রাণ খুলে নিঃশ্বাস নেবে। কিন্তু তা সে পায়নি। পরিবর্তে বাড়ির পিছনদিকের উত্তর-পশ্চিম কোণের সবচেয়ে ছোট ঘরটি পেয়েছে সে । যে ঘরে হাওয়া চলাচল কম, এক জানালা খুললে পড়শীর ভাঙা দেওয়াল আর একটা জানালা খুললে অন্য বাড়ির কলঘর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রক্তকরবী' নাটকের যক্ষপুরীর মতোই মুক্তকেশীর সংসার যেনো যক্ষপুরী। তাই সেই সংসারে কেবল যন্ত্রের মতো সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক কাজগুলো পালন করা আছে কিন্তু তাতে কোনো প্রানের স্পর্শ নেই। তাই মুক্তকেশীর সংসারে 'মেজবৌ' সুবর্ণলতা পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মতোই ছটফটিয়ে মরেছে। এর থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তাকে এক মুহূর্তের জন্য শান্তি দেয়নি। শান্তি দেয়নি তার সাথে থাকা অন্যন্য জড়প্রাণ মানুষগুলোকে-

"কিন্তু সুবর্ণলতা কেন বহির্জগতে বহমান বাতাসের স্পর্শ চায়? এ বাড়ির বৌ হয়েও তার সমস্ত সত্তা কেন মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ছটফট করে? তার পরিবেশ কেন অহরহ তাকে পীড়া দেয়, আঘাত হানে?

তা এ প্রশ্নের উত্তর একদা সুবর্ণলতার বিধাতাও চেয়ে পাননি"।৩

সুবর্ণলতার জীবনে যে মানুষটি সবচেয়ে আপন ছিল সেও কি সম্পূর্ন রূপে সুবর্ণকে চিনতে পেয়েছিল? তা পারেনি। মুক্তিকেশীর অন্যান্য তিন ছেলের তুলনায় মেজছেলে প্রবোধ তার স্ত্রী- কে আর্থিক স্বচ্ছলতা ভালোবাসা বেশি দিলেও দিতে পারেনি সুবর্ণকে মুক্ত জীবনের স্বাদ। কেননা প্রবোধের সেই ভালোবাসায় ছিল সন্দেহের যাতনা। তাই হয়তো জীবনের শেষপর্বে দাঁড়িয়ে সুবর্ণও প্রবোধের ভালোবাসায় সন্দেহ প্রকাশ করে বলে-

“তুমি আমায় খুব ভালোবাসো, তাই না?”৪

সুবর্ণলতা, সত্যবতীর মেয়ে হলেও উভয়ের সংগ্রামের ক্ষেত্রটি অনেকটা আলাদা। বলা যায় সত্যবতীর তুলনায় সুবর্ণলতার জীবন সংগ্রাম আরো বেশি কঠিন। সত্যবতীর মধ্যে যে স্বাধীনমনস্কতা ছিল তা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সে প্রকাশ করেছে। অবশ্য এক্ষেত্রে তার প্রধান সহায় ছিলেন পিতা রামকালী চাটুজ্যে। যার গুরুগম্ভীর ব্যক্তিত্বের কারণে সকলেই তাকে মান্য করে চলতেন। পিতা রামকালীর চরিত্রের গুণ সত্যবতী পেয়েছিল। স্পষ্ট করে নিজের কথা বলার ক্ষমতা ছিল তার। তাই মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষা নিয়ে তার বাবা রামকালী তাকে প্রশ্ন করলে সে সহজেই বলতে পারে-

“এত যদি না দরকারের কথা তো মেয়েমানুষের জন্মাবারই বা দরকার কি, তাই বল তো বাবা শুনি একবার?” ৫

পিতার সামনে এই রকম ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রশ্ন করেও সত্যবতী পিতার সহায়তায়তেই বিদ্যাশিক্ষার অধিকার পায়। রামকালীর কাছে তার মেয়ে সত্যবতীর এই স্বাধীনচেতা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই ছিল প্রিয়। কিন্তু এমন দৃঢ় চরিত্রের পিতৃ সান্নিধ্য তো সুবর্ণলতা পায়নি। তাই মুক্তকেশী সুবর্ণর পিতা নবকুমারকে অপমান করে মেয়ের সঙ্গে দেখা করা বন্ধ করে দিলে তিনি আর জোর করে মেয়ের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেননি। এমন কি স্বামী পরিত্যাক্তা হয়ে যখন সুবর্ণলতা পিতার কাছে আশ্রয়ের জন্য আসে তখনও তিনি সুবর্ণকে আদর করে বুকে টেনে নিতে পারেননি। বরং সুবর্ণকে দেখে ভয় পেয়েছেন –

“মেয়েকে সুস্থির হবার সময় দিতে পারতেন। কাছে বসিয়ে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে তৃষিত পিতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা প্রকাশ করতে পারতেন,কিন্তু নবকুমার তা করলেন না। নবকুমার কেমন যেনো ভয় পেলেন”।৬

নবকুমার মেয়ে সুবর্ণকে বহুদিন পরে দেখেও ভয় পেয়েছেন যদি সে স্বামীত্যাগী হয়ে চিরদিনের মতো তার সংসারবাসিনী হয়ে থেকে যায়। তাই মেয়েকে বুঝিয়ে আবার শ্বশুরবাড়িতে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। সত্যবতীর মতো আত্মাভিমানী সুবর্ণ তাই পিতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অসম্মানের গরল পান করে মুক্তকেশীর সংসারেই আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। নবকুমার কি সেদিন চাইলেই সুবর্ণকে নিজের কাছে রেখে দিতে পারতেন না ? কিন্তু তিনি তা করেননি। কালের দিক থেকে সত্যবতী সুবর্ণলতার থেকে পূর্ববর্তী হলেও সত্য যে মুক্তির স্বাদ পেয়েছিল সুবর্ণ তা পায়নি। তাই ‘সুবর্ণলতা’ সম্পর্কে লেখিকা উপন্যাসের শুরুতেই বলেছেন –

“সুবর্ণলতা’ সেই বন্ধন-জর্জরিত কালের মুক্তকামী আত্মার ব্যাকুল যন্ত্রণার প্রতীক”।৭

‘সুবর্ণলতা’ উপন্যাসের দ্বিতীয়পর্বে দেখা যায় সুবর্ণ মুক্তকেশীর সংসার ছেড়ে নিজের

আলাদা সংসার করেছে-

“অথচ দেখা যাচ্ছে, সুবর্ণলতা ঘর ভেঙে বেরিয়ে এসে আবার ঘর গড়েছে “।৮

সুবর্ণর সেই বাড়িতে ছাদ ছিলো, ছিলো খোলা বারান্দা আর গোলাপি রঙের দেওয়াল। সুবর্ণর মনের মতো। কিন্তু যে মুক্তি সুবর্ণ খুঁজেছিল আলাদা সংসারে এসেও তা পায়নি। সুবর্ণর ইচ্ছা ছিলো ছেলে-মেয়েদের মানুষের মতো মানুষ করে তুলে তাদের মাঝেই নিজের মুক্তির আস্বাদ পাবে। কিন্তু সুবর্ণর সেই ইচ্ছাও পূরণ হয়নি। তার ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা শিখে বড়ো হয়েছে ঠিকই কিন্তু তাদের কাছে সুবর্ণ প্রত্যেকমুহূর্তে অবহেলিত লাঞ্ছিত হয়েছে। বড়ো ছেলে ভানুর মধ্যে সে লক্ষ্য করেছে সেজো দেওরের অবিকল ভাবমূর্তি। যার প্রধান কাজই ছিল সুবর্ণকে ব্যঙ্গ করা –

“ভানুর বিদ্রুপব্যঞ্জক মুখভঙ্গিমায়, চোখের পেশীর আকুঞ্চনে, আর ঠোঁটের বঙ্কিম রেখায় স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে সুবর্ণলতা, এদের বংশের প্রথম গ্র্যাজুয়েট প্রভাসচন্দ্রকে। সুবর্ণলতাকে ব্যঙ্গ করাই ছিল যার প্রধানতম আনন্দ”।৯

ভানু, কানু, মনু, চাঁপা, চন্দন সকলেরই মনোভাবই মায়ের প্রতি প্রায় সমান ছিল। মুক্তকেশীর দর্জিপাড়ার সংসারের আবদ্ধ জীবনের বাতায়নকে সুবর্ণলতার এই সন্তানেরা যেনো সুবর্ণর নতুন সংসারে বহন করে নিয়ে এসেছে। তাই নতুন সংসারে খোলা ছাদ থাকলেও তাতে মুক্তির আস্বাদ সুবর্ণ পায়নি। মুক্তকেশীর ছেলেমেয়েরা যেমনই হোক তবুও তাদের মধ্যে লোক দেখানো মাতৃভক্তিটুকু ছিল। কিন্তু সুবর্ণলতার সন্তানদের মধ্যে সেই ভক্তি শ্রদ্ধাটুকুও ছিল না। কোথাও গিয়ে যেন মুক্তকেশীর কাছে হেরে যায়। সুবর্ণর স্বাধীন মনোভাবের শিক্ষার সঙ্গে মুক্তকেশীর সংসারের বদ্ধ মানসিকতার রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সুবর্ণর ছেলেমেয়েরা তারই প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেছে। প্রত্যেক বাবা-মা চায় তাদের ভবিষ্যত সন্তানদের মধ্যে নিজেদের অস্তিত্ব খুঁজে পেতে। কিন্তু সুবর্ণ আর প্রবোধ তাদের সন্তানদের কাছে পেয়েছে কেবল অবজ্ঞা। সুবর্ণ তার মায়ের শেষ চিঠি পেয়ে নিজের বাঁচার ভিন্নপথ খুঁজে বের করে, শুরু করে লেখালেখি। সেই লেখা যখন পয়সায় দুখানা বর্ণপরিচয়ের কাগজে ভাঙা টাইপ আর পুরু কালিতে বড়োভাসুর জগন্নাথের প্রেস থেকে ছেপে বের হয় তখন সুবর্ণর লেখা সেই বই তার নিজের ছেলেমেয়ের কাছেই হাস্যকর হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে ভানু ব্যঙ্গ করেছিল বেশি-

“হু। ভানু হেসে ফর ফর করে বইয়ের পাতাগুলো উড়িয়ে দিয়ে বলে, আহা, গ্রন্থই বটে। গ্রন্থের নমুনাটি লোককে দেখাবার মতো”।১০

সুবর্ণর লেখা ‘স্মৃতিকথা’ তাদের কাছে হাস্যকর বস্তুছাড়া আর আর কিছুই নয়। আসলে সুবর্ণলতা কলমের মধ্যে যে মুক্তির সন্ধান পেয়েছিল সেই মুক্তিরপথ তো তার পরিবারের কেউ পায়নি। এই ভাবনাই তাকে সবার থেকে আলাদা করে রেখেছে। সুবর্ণলতার কাছে

কবির কবিতা –

“আজি এ প্রভাতে রবির কর,
কেমনে পশিল প্রানের পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত পাখির গান।
না জানি কেমনে এতদিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ”।১১

এ শুধু কবিতা নয়। তার কাছে কবিতা তারই মনের কথার অবারিত উচ্চারণ। কিন্তু অন্যদের কাছে এই কবিতা কেবলই ছন্দে বাঁধা বুলি। আসলে সুবর্ণ যে যুগের প্রতিভূ সে যুগের গৃহস্থ রমণীদের কাঠ-কয়লা উনুনের ধোঁয়া আর সন্তান প্রসব ছাড়া বাইরের জগতের ভাবনা ভাবতে গেলেই পদে পদে তাদের অপদস্ত হতে হতো। সুবর্ণর জীবনেও তাই ঘটেছিল। কিন্তু তাই বলে সুবর্ণলতা নিজের প্রতিবাদী মানসিকতাকে ত্যাগ করতে পারেনি। তাই সে নিজেই বলেছে-

“অভিমানের জ্বালাতেই আমি জীর্ণ হলাম।
তবু আমি চিরদিনই প্রতিবাদ করেছি, চেঁচামেচি করেছি, অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি”।১২

সুবর্ণলতার প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়েছে যখনই সে অন্যায় দেখেছে । পুরোনো সংস্কারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে অপরিষ্কার নোংরা পরিবেশে সন্তান প্রসব করা নিয়ে সে প্রতিবাদ করেছে । ইংরেজ পদানত দেশের স্বাধীনতার ভাবনা তাকে ভাবিয়েছে। স্বাধীনতার সংগ্রামীদের প্রতিবাদ তার রক্তেও জোয়ার এনেছে। ‘বন্দেমাতরম’ ধ্বনিত হয়েছে তার কন্ঠে। পরিবারিক হাজারো প্রতিকূলতাকে এড়িয়ে,এক গৃহবধূ হয়েও খবরের কাগজ পড়ে দেশের ও দশের খবর জেনে নিজের জ্ঞানের পরিধি বিস্তার করেছে । তার এই স্বভাবের কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় শেষের দিকের তিন সন্তানের মধ্যে – সুবল, পারুল,বকুল। এরা ভানু, কানু মনু, চাঁপা এদের থেকে কিছুটা আলাদা। পারুল ও বকুল সুবর্ণলতার শেষদিকের ‘অবহেলার মেয়ে’ হলেও তাদের স্কুলে ভর্তি হওয়া নিয়েও সে লড়াই করেছে। ভানুকে বলেও যখন পারুল , বকুলের স্কুলে ভর্তি করতে পারেনি তখন নিজেই ব্যবস্থা করেছে। কেননা সুবর্ণলতা একথা খুব ভালোভাবে উপলদ্ধি করতে পেরেছিল নারীর যথার্থ মুক্তির জন্য, স্বাধীনতার জন্য নারী শিক্ষার প্রয়োজন। পারুল ও বকুলের স্কুলে ভর্তি হওয়া নিয়েও সংসারে ঝড় তুলেছিল সুবর্ণলতা।পারুল নিজের অভমানিনী মন নিয়ে স্কুলে ভর্তি না হলেও বকুল স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। আবার বকুলের পড়াশোনার ব্যঙ্গ করে বড়োদাদা ভানু যখন নিজের বন্ধুর ভাইঝির পড়াশোনার প্রশংসা করে তখনও সেখানে প্রতিবাদী হয়েছে সুবর্ণলতা। তাই বকুলের পড়াশোনার জন্য বাড়িতে মাস্টার রাখার ব্যবস্থা করে। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রেও সুবর্ণলতার

ভিন্ন রকমের চিন্তা ভাবনা লক্ষ্য করা যায়। দেশমায়ের বন্দনায় সে মুখরিত হয়ে উঠেছে । সুবালার ঠাকুরপো অম্বিকা স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য জেল খেটেছে একথা জানার পর তার প্রতি সুবর্ণর শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। কিন্তু এই সুবর্ণকে তার ছেলে কানু যখন চরকায় সুতো কাটার কথা বলে তখন সে সেই কাজকে দেশের স্বাধীনতার কাজ মনে না করে , মনে করেছে 'ফ্যাশন'। তাই কানুকে সুবর্ণ বলেছে –

"তা টির এই সুতো কাটার মধ্যে ক্লেশই বা কই? দুঃখই বা কই? আর গেরেস্তঘরের মেয়েমানুষের অবসরই বা কই?"১৩

সুবর্ণ নিজের এই কথার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে তার ছেলে হুজুকে মেতেছে আর হুজুকে বা ফ্যাশনের মধ্য দিয়ে দেশে স্বাধীনতা আনা সম্ভব নয়। শুধু কি তাই, সুবর্ণ এই কথার মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে, যে দেশের গৃহস্থ বধূরা নিজেরাই স্বাধীন নয়, স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদ যারা জানেই না, হেঁসেল, আতুরঘর আর কুটকচালিই যাদের বিচরণ ক্ষেত্র, সেই দেশের গৃহস্থ মেয়েরা চরকায় সুতো কেটে স্বাধীনতা আনবে কি করে? স্বাধীনতা আনতে হলে তার প্রকৃত অর্থ জানতে হয়। যারা নিজেরা পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ তারা স্বাধীনতার অর্থ জানবে কি করে?

সংসারের চক্রব্যূহে থেকে লড়াই করতে করতে প্রত্যেক মুহূর্তে রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত হয়েছে সুবর্ণলতা। সংসারে কেউ তাকে ভালোবেসে উঠতে পারেনি। যে মুক্তি সে আজীবন চেয়েছে সে মুক্তি পেয়েছে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই নিজের জীবনের শেষ প্রতিবাদটা ঘোষণা করে গেছে সে। নিজের সেই বোবা যন্ত্রণার ব্যথা নিজের সন্তানের মধ্যে সঞ্চার করে দিয়ে গেছে সে। সুবর্ণর জীবনের সেই যেনো একমাত্র সার্থকতা। ভস্মীভূত ছাই থেকে আগুনের এক স্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলে উঠেছে বকুল। সুবর্ণর শেষদিকের 'অবহেলিত মেয়ে'। যার একপ্রকার কোনো গুরত্বই ছিলো না কারোর কাছে। সুবর্ণর মৃত্যুর পর একমাত্র তার শেষ সন্তান বকুল শুনতে পেয়েছিল তার মায়ের 'বোবা যন্ত্রণার ইতিহাস'। তাই সে বলেছে-

" মা, মাগো! তোমার পুড়ে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া লেখা, না লেখা সব আমি খুঁজে বার করবো, সব কথা আমি নতুন করে লিখবো, দিনের আলোর পৃথিবীকে জানিয়ে যাবো অন্ধকারের বোবা যন্ত্রণার ইতিহাস।.....

যদি সে পৃথিবী সেই ইতিহাস শুনতে না চায় যদি অবজ্ঞার চোখে তাকায়, বুঝবো আলোটা আর আলো নয়, মিথ্যা জৌলুসের ছলনা,ঋণ শোধের শিক্ষা হয়নি তার এখনো"।১৪

সুবর্ণলতা নিজের মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তো শেষ প্রতিবাদটা ঘোষণা করে দিতে গেছে। বেচেঁ থাকতে তার যে যন্ত্রণার কথা কেউ শুনতে চায়নি, তার প্রকৃত পরিচয় পায়নি, জানতে পারেনি সে নিরক্ষর ছিল না। মৃত্যুর পর নিজের সেই অস্তিত্বের কথাই সে জানান দিয়ে

গেছে বকুলের মধ্য দিয়ে। তাই তো বকুল তার মৃত মাকে অমর করে তুলতে চেয়েছে তার লেখার মধ্য দিয়ে । নিজের প্রতিবাদী সত্তাকে সুবর্ণলতা বকুলের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়ে গেছে । এখানেই তো সুবর্ণর যথার্থ মুক্তি। এখানেই সুবর্ণ জয়ী হয়েছে।

সুবর্ণলতার মতো অনেক মেয়েই সংসারের গোলক ধাঁধায় হারিয়ে গেছে। সমাজ সংসারের প্রতিনিয়ত অবহেলায় হারিয়ে গেছে যাদের প্রতিভা ও সত্তা। তাদের কথাই 'সুবর্ণলতা' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে আশাপূর্ণা দেবী তুলে ধরতে চেয়েছেন। সুবর্ণলতার মতো মেয়েদের বোবা যন্ত্রণার কথা তিনি বলেছেন উপন্যাসে। সুবর্ণলতা তাই একক নারীর কাহিনী নয়, তা যুগের প্রতিভূ। আর বকুল তার উত্তরসূরি।

তথ্যসূত্র:-

১. আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্প সংকলন, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া, প্রথম প্রকাশ- 1993, পৃ:vii ।
২. দেবী আশাপূর্ণা, প্রথম প্রতিশ্রুতি, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ- ফাল্গুন ১৩৭১ ।
৩. দেবী আশাপূর্ণা, সুবর্ণলতা , মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ- চৈত্র ১৩৭৩, পৃ:৩৭ ।
৪. দেবী আশাপূর্ণা, সুবর্ণলতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ – চৈত্র ১৩৭৩, পৃ:৪১৮।
৫.দেবী আশাপূর্ণা, প্রথম প্রতিশ্রুতি, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ – চৈত্র ১৩৭৩, পৃ:১৩১।
৬. দেবী আশাপূর্ণা, সুবর্ণলতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ – চৈত্র ১৩৭৩, পৃ:৮৬।
৭. দেবী আশাপূর্ণা, সুবর্ণলতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ – চৈত্র ১৩৭৩ ।
৮. দেবী আশাপূর্ণা, সুবর্ণলতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ – চৈত্র ১৩৭৩, পৃ:২৪৩।
৯. দেবী আশাপূর্ণা, সুবর্ণলতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ – চৈত্র ১৩৭৩, পৃ:২৫১।
১০.দেবী আশাপূর্ণা, সুবর্ণলতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ – চৈত্র ১৩৭৩, পৃ:৩৭৬।
১১. দেবী আশাপূর্ণা, সুবর্ণলতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ – চৈত্র ১৩৭৩, পৃ:৩৫০।
১২. দেবী আশাপূর্ণা, সুবর্ণলতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ – চৈত্র ১৩৭৩, পৃ:৩৫৫।
১৩. দেবী আশাপূর্ণা, সুবর্ণলতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ – চৈত্র ১৩৭৩, পৃ:৩৭২।
১৪. দেবী আশাপূর্ণা, সুবর্ণলতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ – চৈত্র ১৩৭৩, পৃ:৪৩৮।

নূতন কলমে
কিছু শিখবো, কিছু লিখবো

বীরাঙ্গনা কাব্যের পরিপূরক উত্তর বীরাঙ্গনা কাব্য

ড. জয় দাস
সহকারী অধ্যাপক; বাংলা বিভাগ, দিনহাটা মহাবিদ্যালয়

বাঙ্গলা সাহিত্য সেবায় তাঁহার মূল লক্ষ ছিল প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলন। "শরীরং যা পাতয়েয়ং কার্য্যং বা সাধয়েয়ম"- হয় শরীর পাতন না হয় কার্য সাধন; ইহাই তিনি সাহিত্য সেবার মূলমন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত সকল গ্রন্থের প্রচ্ছদপটে যে সাঙ্কেতিক চিহ্ন মুদ্রিত থাকিত তাহা ঐ মন্ত্রের দ্যোতক; তার একদিকে সিংহ, প্রতীচ্যের দ্যোতক। উভয়ের মধ্যে (কাব্য প্রতিভা) রবি নিম্বের (বঙ্গসাহিত্য) শতদলকে সমুদ্ভাসিত করিতেছে।... মধুসূদনের গ্রন্থের সহিত উহা চিরমুদ্রিত থাকা উচিত, কারণ উহাই তাঁহার সাহিত্য সেবার মূলমন্ত্র।১

মধুসূদন দত্ত (১৮২৪ – ১৮৭৩) অথবা কবি শ্রীমধুসূদন সম্বন্ধে আমরাও বলতে পারি – তাঁর কবি আত্মা তথা ব্যক্তিত্ব প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মেলবন্ধনে সৃজিত। তাকে আলাদা করে দেখতে যাওয়াই মানে দেহ থেকে আত্মাকে পৃথক করে দেখা। মধুসূদন ছিলেন বহুভাষাবিদ্। তিনি বাংলা, ইংরেজি ছাড়াও সংস্কৃত, ল্যাটিন, গ্রীক, মাদ্রাসে থাকাকালীন ফরাসী, ইতালী, জার্মানি প্রভৃতি নানান ভাষায় নিজেকে সমৃদ্ধ করেছিলেন।২ তাই তাঁর Captive Lady(১৮৪৯) থেকে চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী(১৮৬৬) পর্যন্ত আমরা দেখি সেখানে তিনি ভারতের ইতিহাসের গাঁথা গাইছেন আধুনিক মনন চিন্তনে। মধুসূদনের কাছে ব্যক্তিই আগে। খ্রিস্টান বা হিন্দুধর্ম নয় মানবতার ধর্মই তাঁর কাছে আদর্শ। তাঁর সাহিত্যে তথা জীবনে তিনি এই ঘোষণা করেন। এটাই স্বাভাবিক কারণ প্রতিটি যুগের-ই একটি নিজস্ব ভাষা থাকে তা কোন কবির লেখনীর মাধ্যমে ফুটে ওঠে। অনেকেই আশা করে তা শোনার আর সেটি হঠাৎ করে আসে বলেই সেটি নতুন, ধূমকেতুর মত বিস্ময়ের। পুরাতনকে তা ভাঙ্গে বলেই তিনি পুরাতনপন্থীদের কাছে নিন্দনীয়। বিশ্বকর্মা যেমন তিল তিল সুন্দর নিয়ে তিলোত্তমা সুন্দরীকে তৈরি করেন, তেমনি মধুসূদন তাঁর সৃজিত সাহিত্যে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য নির্বিশেষে যা কিছু ভালো, গ্রহনীয়, যুক্তিযুক্ত, আধুনিক উনিশ শতকের বাংলায়'- তা নিয়ে তাঁর কাব্য, নাটক প্রভৃতি রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত 'বীরাঙ্গনা কাব্য'(১৮৬২) ছিল ওভিদের(৪৩ খ্রীষ্ট-পূর্ব- ১৭/১৮ খ্রীষ্টাব্দ) 'Heroic Epistles'-এর আদর্শে রচিত। পুরাণের নায়িকাদের অন্তর্নিহিত বক্তব্যদের তিনি তাঁর কাব্যের মাধ্যমে তুলে ধরেন। পত্রের একটি গুণ হল সেখানে আঁতের কথা সহজে বলা যায়, কেননা বিপক্ষের ব্যক্তির তর্ক সেখানে থাকেনা। সমাজিকতার বেড়াজালে যা কিছু থাকে ব্যক্তিগত পত্র তা সহজেই বের করে আনে। 'বীরাঙ্গনা কাব্য' সেই কথাগুলি বের করে আনে। মনস্তাত্ত্বিক আলোচনা শুরু হয় ইউরোপে ফ্রয়েডের(১৮৫৬-১৯৩৯) হাত ধরে আর আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের(১৮৬১-১৯৪১) 'চোখের বালি'(১৯০৪) উপন্যাসকে প্রথম সার্থক মনস্তাত্ত্বিক সাহিত্য ধরি বাংলা সাহিত্যে। কিন্তু এর অনেক আগেই 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'

মধুসূদন নায়িকাদের মনস্তাত্ত্বিক দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, ভালোবাসা, ক্ষোভ প্রভৃতির কথা বলে গেছেন। উনিশ শতকে নারীদের যে বিশেষণগুলি ছিল স্ত্রী, ভার্যা, কর্ত্রী প্রভৃতি সেগুলিতে নারীব্যক্তিত্বের স্বাধীন সত্তার পরিচয় মেলে কী? কিন্তু 'বীরাঙ্গনা' এই নামটির মধ্যে সেই ব্যক্তিত্ব, একক মানসিকতার পরিচয় মেলে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' মোট ২১টি পত্র লেখার কথা ভাবেন

... I have been scribbling a thing to be called 'বীরাঙ্গনা' i.e. Heroic Epistles from the most Puranic women to their lovers or lords. There are to be twenty-one Epistles, and I have finished eleven.৩

কিন্তু সম্পূর্ণ করতে পারেন মাত্র ১১টি কারন সেসময় তাঁর বেশি মন ছিল বিদেশ যাত্রায় আর ব্যারিস্টার হওয়ায়-

No more Modhu the 'কবি', old fellow, but Michael M.S. Dutt Esquire of the Inner Temple Barrister-at-law!! Ha!! Ha!! Isn't that grand?৪

মধুসূদন দত্ত 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র যে ১১টি কাব্য রচনা করেন সেগুলি হল-

১। দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা
২। সোমের প্রতি তারা
৩। দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী
৪। দশরথের প্রতি কেকয়ী
৫। লক্ষ্মণের প্রতি সূর্পনখা
৬। অর্জ্জুনের প্রতি দ্রৌপদী
৭। দুর্য্যোধনের প্রতি ভানুমতী
৮। জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা
৯। শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী
১০। পুরুরবার প্রতি উর্ব্বশী
১১। নীলধ্বজের প্রতি জনা

এছাড়াও মধুসূদন দত্ত- ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারী, অনিরুদ্ধের প্রতি ঊষা,যযাতির প্রতি শর্ম্মিষ্ঠা, নারায়ণের প্রতি লক্ষ্মী, নলের প্রতি দময়ন্তী এই পাঁচটি পত্রের খসড়া তৈরি করেছিলেন কিন্তু সমাপ্ত করতে পারেননি।৫

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে অভিনব চিন্তাধারা সর্বোপরি অমিত্রাক্ষর ছন্দ সেই সময় অনেক কবিদের প্রভাবিত করেছিল। দেবেন্দ্রনাথ সেন

লিখেছিলেন ‘অপূর্ব বীরাঙ্গনা’(১৯১২) কাব্যটি। ‘বীরাঙ্গনা কাব্যে’র পত্র গুলির প্রত্যুত্তরগুলি লিখেছিলেন গুরুনাথ সেন ‘বীরোত্তর কাব্য’ নামে।

পত্রকাব্য রচনার প্রতি আকর্ষণ একালের কবিদের রচনাতেও লক্ষ্য করা যায়। সম্প্রতি যোগীন্দ্রনাথ মজুমদার ‘উত্তর-ব্রজাঙ্গনা কাব্য, উত্তর-বীরাঙ্গনাকাব্য’(১৯৮৯) রচনা করে পুরাতন আদর্শ অনেকটা ফিরিয়ে এনেছেন। মধুসূদন যে-কয়খানি পত্রের যৎসামান্য রচনা করে ফেলে রেখেছিলেন, দ্বিতীয় খণ্ড রচনার অবকাশ পাননি, যোগীন্দ্রনাথ মজুমদার সেগুলি নতুনভাবে লিখেছেন, তা ছাড়াও অগ্নির প্রতি স্বাহা, অগস্ত্যের প্রতি লোপামুদ্রা, ভীমের প্রতি দ্রৌপদী, বিল্বমঙ্গলের প্রতি চিন্তামণি, জয়ানন্দের প্রতি চন্দ্রাবতী-এই চারখানি অতিরিক্ত সংযোজনা করেছেন।৬

যোগীন্দ্রনাথ মজুমদার মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘ব্রজাঙ্গনা কাব্য’ ও ‘বীরাঙ্গনা কাব্য’টি সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করেন। তিনি মাইকেলকে সরাসরি অনুকরণ করেননি। ‘উত্তর বীরাঙ্গনা কাব্যে’ তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার করেন তবে তা অনেকটাই সংস্কৃত কঠিন শব্দের বাহুল্য বর্জিত।

উত্তর বীরাঙ্গনায় যোগীন্দ্রনাথের মধুসূদনের ভঙ্গি অনুসরণ করে পত্রকাব্য রচনা করেছেন, তাতে আছে দশটি পত্র। এর নায়িকারা কেউ মহাকাব্যের, কেউ পুরাণের, কেউ লোকগাথার। আগাগোড়া রচনাই অমিত্রাক্ষর ছন্দে। লেখক যোগীন্দ্রনাথের রোমান্টিক মনের প্রকাশ উত্তর ব্রজাঙ্গনায় আর তাঁর ক্ল্যাসিক্যাল প্রবণতা দেখি উত্তর বীরাঙ্গনায়।৭

যোগীন্দ্রনাথ মজুমদার যে দশটি পত্র রচনা করে এই পত্র কাব্যটি সমাপ্ত করেন সেগুলি হল-

১। ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারী
২। অনিরুদ্ধের প্রতি ঊষা
৩। যযাতির প্রতি শর্মিষ্ঠা
৪। নারায়ণের প্রতি লক্ষ্মী
৫। নলের প্রতি দময়ন্তী
৬। অগ্নির প্রতি স্বাহা
৭। অগস্ত্যের প্রতি লোপামুদ্রা
৮। ভীমের প্রতি দ্রৌপদী
৯। বিল্বমঙ্গলের প্রতি চিন্তামণি
১০। জয়ানন্দের প্রতি চন্দ্রাবতী

‘উত্তর বীরাঙ্গনার কাব্যে’র পত্রগুলি ‘বিদগ্ধ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ‘উত্তর বীরাঙ্গনা কাব্য’ সম্পর্কে যোগীন্দ্রনাথ মজুমদার নিজেই নিবেদন অংশে জানান-

বীরাঙ্গনা কাব্যে মধুসূদন আদ্যান্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেছেন। উত্তর বীরাঙ্গনায় সেই ছন্দই রক্ষিত হয়েছে। বীরাঙ্গনার অসম্পূর্ণ পাঁচটি পত্রিকা উত্তর বীরাঙ্গনায় সম্পূর্ণ করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত নূতন পাঁচটি পত্রিকার মধ্যে 'অগ্নির প্রতি স্বাহা' 'অগস্ত্যের প্রতি লোপামুদ্রা' এবং 'ভীমের প্রতি দ্রৌপদী' এই তিনটি পত্রিকার উপাদান মহাভারত হতে সংগৃহীত হয়েছে। বিল্বমঙ্গল (লীলাশুক) বিরচিত কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থ পদলালিত্যে ও ছন্দোমাধুর্যে গীত-গোবিন্দের প্রতিস্পর্ধী। পৌরাণিক কাহিনী না হলেও বিল্বমঙ্গলের জীবন বৃত্তান্ত মহিমান্ডিত বলেই উত্তর বীরাঙ্গনায় তা স্থান পেয়েছে। বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর জীবনকাহিনী ময়মনসিংহ গীতিকা হতে আহরণ করা হয়েছে।৮

সত্যি মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র পত্রগুলিতে যেমন কাব্যের সাথে নাট্যগুন বিদ্যমান সেইসঙ্গে অন্তর্নিহিত মানসিক দ্বন্দ্ব, যা ঘটনার থেকেও বেশি প্রাধান্য পায়, তা যেমন আমরা পাই 'উত্তর বীরাঙ্গনা কাব্যে' তা আমরা পাইনা। সেখানে ঘটনার প্রাধাণ্য বেশি থাকে। যেমন- 'ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারী' পত্রে গান্ধারী বলে

... ভাবিব কেবল মনে
এক বৃন্তে দুটি পুষ্প- অন্ধ মহারাজ
ধৃতরাষ্ট্র-অন্ধ তার প্রেয়সী গান্ধারী।
দুটি অর্ধে মিলে দোঁহে চাই পূর্ণ হতে;
পূর্ণতা আসিবে শুধু হৃদয়ে হৃদয়ে।৯

নূতন ফলগে
কিছু শিখবো, কিছু লিখবো

আবার

দেখার অনেক সুখ ভুঞ্জিয়াছি আমি
না হেরিলে আরো সুখ লভিব এখন।
দাসী আনিয়াছে বস্ত্র আদেশে আমার
বহুবার বেড়ি বস্ত্রে ঢাকিব নয়ন।১০

দ্বিতীয় পংক্তির একই কথা আমরা মধুসূদন দত্তের অমিত্রাক্ষর ছন্দে পাই-

... পতি তুমি; কি সাধে ভূঞ্জিব,
সে সুখ, যে সুখভগে বঞ্চিলা বিধাতা
তোমারে, হে প্রাণেশ্বর! আনিতেছে দাসী
কাপড়, ভাঁজিয়া তাহে, সাতবার বেড়ি
অন্ধিব এ চক্ষু দুটি কঠিন বন্ধনে,
ভেজাইব দৃষ্টি-দ্বারে কবাট।১১

আবার একই ভাবে ‘অনিরুদ্ধের প্রতি ঊষা’র পত্রের প্রারম্ভিক ছত্রগুলিতে পাই

দানবাধিপতি বাণ ভুবনবিজয়ী
নর-দৈত্য-দেবত্রাস মহারথী, বলী
তাঁহারি তনয়া ঊষা নমিছে তোমারে
আজি ভক্তিভরে।১২

আবার একই বক্তব্য আমরা মধুসূদনের পত্রে পাই-

বাণ-পুরাধিপ বাণ-দানব-নন্দিনী
ঊষা, কৃতাঞ্জলি পুটে নমে তব পদে,
যদুবর! পত্রবহ চিত্রলেখা সখী-
দেখা যদি দেহ, দেব, কহিবে বিরলে।
প্রাণের রহস্য কথা প্রাণের ঈশ্বরে!১৩

‘ভূমিকা’ অংশে শ্রী ভবতোষ দত্ত মহাশয় বলেছেন-

তাই উত্তর বীরাঙ্গনায় মধুসূদনের সচেতন অনুকরণ সত্ত্বেও এসেছে অচেতন মৌলিকতা। এই নায়িকাচরিত্রে দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে ওঠে নি।১৪

কিন্তু ব্যতিক্রম আছে। যেখানে স্বাধীনভাবে যোগীন্দ্রনাথ মজুমদার লিখেছেন ‘বিল্বমঙ্গলের প্রতি চিন্তামণি’ সেখানে মনের আর্তি বক্তব্য খুব সুন্দরভাবে তিনি তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছেন-

ভুলিয়েছি ভুজনে এই দেহ দিয়া;
পাছে দেহস্পর্শ ঘটে তাই কুণ্ঠা এত।
মহত্তম প্রেম শুধু রাখি প্রেমিকেরে
বহু দূরে; নিত্য ভালোবাসিতে সে পারে।১৫

মধুসূদনের মত প্রত্যেক পত্রের শুরুতে নেই কোনো প্রারম্ভিক পরিচয়। কিন্তু প্রতি পত্রের শেষে ‘বীরাঙ্গনা কাব্যে’র রীতি ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন- ‘ইতি শ্রীউত্তরবীরাঙ্গনাকাব্যে চিন্তামণি-পত্রিকা নাম নবম সর্গ।।’

‘বীরাঙ্গনা কাব্যে’র যে ব্যক্তব্য এই কাব্যে হয়ত ততটা নেই তবু এই পত্রকাব্যের কাব্যিক মূল্য অপরিসীম। মাইকেল মধুসূদন দত্তকে শ্রদ্ধার জন্যে শুধু নয় এখনো অনেক বিষয় নিয়ে ‘বীরাঙ্গনা কাব্য’ রচনাকরা যেতে পারে তা কবি দেখিয়েছেন। এখন আরো ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে নারীবাদী সমালোচনার তবু ‘বীরাঙ্গনা কাব্যে’র পত্রগুলির গুরুত্ব ম্লান হয়নি

একটুকুও। যোগীন্দ্রনাথ মজুমদার চেষ্টা করেছেন তা সম্পূর্ণ করতে কিন্তু পরিপূর্ণ করতে আমাদের এখনো লড়তে হবে সামাজিকতায় আর মননের মানসিকতায়।

তথ্যসূত্রঃ

১. 'মধুসূদনের সংস্কৃতচর্চা', গার্গী দত্ত, মূলগ্রন্থ. ধ্রুপদী মধুসূদন, করুণা প্রকাশনী, ১৯৯১, পৃষ্ঠা.১৮।
২. 'মধুস্মৃতি', নগেন্দ্রনাথ সোম, দীপ প্রকাশন, বইমেলা ২০০৬, পৃ. ২৭১।
৩. রাজনারায়ণ বসু'কে লেখা মাইকেল মধুসূদনের পত্র, ষটচত্বারিংশ পত্র, 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত', যোগীন্দ্রনাথ বসু, দে'জ পাবলিশিং।। কলকাতা ৭৩, তৃতীয় সংস্করণ ২০০৪, পৃ- ৩৬২।
৪. ঐ, পৃ- ৩৬৩।
৫. 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত', যোগীন্দ্রনাথ বসু, দে'জ পাবলিশিং।। কলকাতা ৭৩, তৃতীয় সংস্করণ ২০০৪, পৃ- ৩৫৩-৩৫৬।
৬. 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' সপ্তম খণ্ড, আসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পুনমুদ্রণ-২০০৯, পৃ- ৪১৭-৪১৮।
৭. 'উত্তর ব্রজাঙ্গনা কাব্য ও উত্তর বীরাঙ্গনা কাব্য', যোগীন্দ্রনাথ মজুমদার, শশধর প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, পুনঃমুদ্রণ- ২০১২, ভূমিকা অংশ।
৮. ঐ, নিবেদন অংশ।
৯. 'উত্তর ব্রজাঙ্গনা কাব্য ও উত্তর বীরাঙ্গনা কাব্য', যোগীন্দ্রনাথ মজুমদার, শশধর প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, পুনঃমুদ্রণ- ২০১২, পৃ- ৮৩।
১০. ঐ, পৃ- ৭৮।
১১. 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত', যোগীন্দ্রনাথ বসু, দে'জ পাবলিশিং।। কলকাতা ৭৩, তৃতীয় সংস্করণ ২০০৪, পৃ- ৩৫৩।
১২. 'উত্তর ব্রজাঙ্গনা কাব্য ও উত্তর বীরাঙ্গনা কাব্য', যোগীন্দ্রনাথ মজুমদার, শশধর প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, পুনঃমুদ্রণ- ২০১২, পৃ- ৮৪।
১৩. 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত', যোগীন্দ্রনাথ বসু, দে'জ পাবলিশিং।। কলকাতা ৭৩, তৃতীয় সংস্করণ ২০০৪, পৃ- ৩৫৪।
১৪. 'উত্তর ব্রজাঙ্গনা কাব্য ও উত্তর বীরাঙ্গনা কাব্য', যোগীন্দ্রনাথ মজুমদার, শশধর প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, পুনঃমুদ্রণ- ২০১২, ভূমিকা অংশ।
১৫. 'উত্তর ব্রজাঙ্গনা কাব্য ও উত্তর বীরাঙ্গনা কাব্য', যোগীন্দ্রনাথ মজুমদার, শশধর প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, পুনঃমুদ্রণ- ২০১২, পৃ- ১২৮।

নূতন কলমে কিছু শিখবে, কিছু লিখবো

যখন গরীব হয়ে যাই

ইমরান নাজির পাটোয়ারী
স্নাতকরত (ষষ্ঠ অর্ধবর্ষ), বাংলা বিভাগ, দিনহাটা মহাবিদ্যালয়

উন্মুক্ত আকাশের নিচে একদিন বসে পুরো এককাপ ব্লাক কফি সাবার করে শুধু নিজের পার্সোনাল সেক্রেটারী কে বলতে যাবো যে " আমার গাড়িটি কি ঠিক হয়েছে।" ... ঠিক তখন ই একটা ফোনকল এলো, আমাকে যানানো হলো আমি গরীব হয়ে গিয়েছি। আর বলা হলো আপনার সমস্ত কিছু আজ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হলো। ফোনের ওপাসে থাকা ব্যক্তিটা কে বলতে যাবো যে আপনি কে বলছেন তার আগেই দেখছি আমার সেক্রেটারি উধাও হয়ে গেছে। পড়নেও দেখি একটা ছেঁড়া পাতলা ময়লা পাঞ্জাবি আর একটা সাদা একটি পাজামা । অপ্রস্তুত হয়ে বসে পড়লাম, মাটির তলাটাও দেখি ভেজা কর্দমাক্ত। বুঝতে পারলাম কিভাবে যেন একটা বস্তিতে এসে উপস্থিত হয়েছি। বাঁহাতের ঠিক পাশেই একজন মহিলা বয়স ৪৫ কি ৫০ হবে, প্রসব যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। তাঁর স্বামী গত পরশুদিন একটি লড়ির তলায় পিশে গেছে। মহিলাটাকে হাসপাতালে নেওয়ার ও কেউ ছিল না। তার ঠিক কাছেই কিছু উলঙ্গ ছেলে একসাথে মারামারি করছিল কে আগে লঙ্গরখানায় খাবার নিবে বলে।এইদিকে আমি নিজেই প্রচন্ড খিদে তৃষ্ণায় পাগলের মত ছুটে বেরাচ্ছি। আমাদের পাড়ায় তো ডাস্টবিন ছিল কিন্তু বস্তি তে তো একটা ডাস্টবিন ও নেই যে উচ্ছিষ্ট কিছু তুলে খাব। সেইসময় একটা বাদামি মেয়ে আমাকে তাদের ঝুপরি ঘরে ডেকে নিয়ে গুড়-মুড়ি খেত দিয়েছিল। গায়ের রং টা বাদামি হলে কি হবে,বীভৎস চেহারা, উস্কো খুস্কো মাথার চুল দেখে বুঝতে দেরি হলো না দারিদ্র্যের প্রকাণ্ড দেয়াল তাদের মাথার উপরেও চেপে বসেছিল। তাই আমার ঠাঁই খুব একটা দীর্ঘস্থায়ী হলো না। পাগলের মত হন্যে হয়ে মাথা গোঁজার বাসস্থান খুঁজতে মরিয়া হয়ে উঠলাম ।তৎক্ষণাত মনে হল গত বছরে সমুদ্রে গিয়ে গাংচিলের ডানায় ভেসে ভেসে যে আনন্দটুকু মনে সঞ্চয় করে রেখেছিলাম তার সবটুকু এখন জলের দরে বিক্রি হয়ে গিয়েছে। কে কিনলো আমার সেই সুখ? এই প্রশ্ন ভাবতে ভাবতে আরো একটু গরীব হয়ে গেলাম। এবার আর নিজেকে ঢেকে রাখতে পারলাম না, গায়ের ময়লা পাঞ্জাবিটাও দু-তিনটা বাচ্চা টেনে ছিড়ে দিয়ে গেল, আমার একটাই অপরাধ আমি তাদের বস্তিতে ঢুকে পড়েছি। অতিরিক্ত গরীব হলে বোধ হয় এমনই হয় , "মানুষ নৃশংস হয়ে যায়!" কিন্তু আমি তো এই বস্তির গরীবের থেকেও গরিব হয়ে গিয়েছি। তাদের তো রাতে চোখ বন্ধ করার ঠাঁই টুকু আছে,কিন্তু আমার নিজের বলতে আমি ছাড়া এখন কিছুই দেখছি না। একটা সময় দামি পারফিউম মেখে ঘুরে বেড়ানো স্বভাব হয়ে গিয়েছিল এখন ড্রেনের পচা জলের সংস্পর্শে এসে পারফিউমের গন্ধ প্রায় ভুলে যেতে বসেছি। দিশেহারা হয়ে সন্ধ্যা নামার আগেই গলির মোড় ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। হাঁটতে হাঁটতে পায়ে ব্যাথা হয়েছে কিনা সেটিও খেয়াল করার সুযোগ পেলাম না। সারারাত ধরে হেঁটে পৌঁছে গেলাম একটা গ্রামে, না 'টাকাওয়ালার কুঠি'। বেশ কয়েক

সেকেন্ডের জন্য চোখ কপালে উঠে গেল, আমি কোথায় এসে পড়লাম। মনের ভিতর তখন একটা ভীষণ রকমের ভয় কাজ করছিল যে এই গ্রামে কি আমার মত একজন ও নেই যাদের আমি বন্ধু বানাবো। অগ্রহায়নের মাস পেরিয়ে আজ পৌষের ১ তারিখ ,ঠান্ডাও দেখি আমার সঙ্গে বেশ জমিয়ে এসেছে। পাশ কাটিয়ে যাবার সময় একদল শৈত্যপ্রবাহ আমাকে বলে গেল "তৈরি হয়ে থাকুন যাওয়ার সময় নিয়ে যাব।" কোথায় নিয়ে যাবে সেই ঠিকানাটা বলে গেল না ,আমিও জিজ্ঞেস করলাম না! কারণ ততক্ষণে আমার শরীর অসাড় হয়ে গিয়েছে, শীতগুলো আমাকে ঘিরে যেন মহাপ্রলয়ের নৃত্য আরম্ভ করেছে । তাদের আসলে দোষ কি! টাকাওয়ালার কুঠিতে বাইরে কাউকে না পেয়ে আমাকেই তারা খোলা আকাশের নিচে আপ্যায়ন শুরু করে দিয়েছে। হুট করে চোখ নিচে যাওয়ায় দেখি কিছু পিঁপড়ে মুখে ডিম নিয়ে তাদের গন্তব্যের দিকে যাওয়ার সময় আমাকে বলে গেল 'আমাদের কাছ থেকে একটা ডিম কিনুন না!' আজ বেশ কয়েকদিন থেকে অভুক্ত রয়েছি, আমি বুঝলাম তাদেরও সমাজে উঁচু-নিচু রয়েছে। কেউ কাউকে ভালোবাসে না। আর ভালোবাসলেও সেটা স্বার্থের কাছে সময় সুযোগ বুঝে বিক্রি করে দেয়। তারপর আমি বললাম আমার কাছে একটি টাকাও নেই আমি তোমাদের থেকে কিছু নিতে পারবো না, এটা বলে যেই ক্ষমা চাইতে যাব অমনি একটি পিঁপড়া আমার পায়ে একটা কামড় বসিয়ে চলে গেল। হায়! সত্যিই আমি কত অসহায় পড়েছি আরো একবার অনুভব হয়ে গেল। যে আমি একটা সময় কত না কিছু করেছি, সাদা ভাল্লুক দেখবো বলে মাইলের পর মাইল পাড়ি দিয়েছে উওর দিকে, হরিনের কলিজা খাওয়ার জন্য দুহাতে অর্থ ব্যয় করেছি,আর আজ আমার কলিজা খাওয়ার জন্য ওত পেতে বসে আছে কতশত রাস্তার কুকুর। "আমি তোমার সাথে হিমালয় দেখতে চাই" বলা মেয়েটি এখন বোধহয় একাই হিমালয় পর্বতের চূড়ায় উঠে নিজের শাড়ীর আঁচল ঠিক করতে করতে সূর্যদয় দেখছে। ড্রয়িং রুমে ইতালীয়ান সোফাটায় মুখোমুখি বসে বাসন্তী আর আমি কতদূর পর্যন্ত একসাথে হাঁটলে ক্লান্ত হবো না তার হিসাব মেলানোর চেষ্টা করতাম। আরো কতকিছু মনে হতে লাগলো সেইসময়। হঠাৎ ই একপাশ থেকে শুরু গেল তখন মশাল মিছিল,লক্ষ লক্ষ কঙ্কাল মাথা নাড়তে থাকলো,সবাই বাঁচতে চায়, সবাই খাদ্য চায়,নিজেও সামিল হয়ে গেলাম মিছিলে। বজ্রকণ্ঠে বলে উঠলাম "গরীব মানুষ আমি.....আমি গরীব"। আমারও চাই....সব চাই।" তখন ই আমার ঘুম ভেঙে গেল, তারপর থেকে অনেক খুঁজেছি ঐ বাদামি মেয়ে,সেই বস্তিতে থাকা মহিলার ছেলে হলো নাকি মেয়ে সন্তান হলো তাও জানার জন্য মরিয়া হয়ে ঘুরেছি অনন্তকাল! কিন্তু দেখা পাইনি। আমি গরীব হয়েই থাকে চেয়েছিলাম কারণ একটুখানি ক্ষুধার তাড়না আমার ভীষন প্রয়োজন ছিল। পরিশেষে আবার ও গরীব হলাম, তবে এবার পৃথিবীতে এসে মৃত্যুর কাছে।

বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি: বিষ্ণুপুরের দুই দিন

অমর বর্মণ
প্রাক্তন ছাত্র, বাংলা বিভাগ, দিনহাটা মহাবিদ্যালয়

■ ভূমিকাঃ

বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন ও ঐতিহাসিক স্থানগুলির মধ্যে একটি হল বাংলার বিষ্ণুপুর। এই স্থানটি বাঙালি সংস্কৃতি, শিল্প, কলা, ধর্ম ও ঐতিহ্যের একটি অনন্য উদাহরণ। বিষ্ণুপুরের মুখ্য আকর্ষণ হল তার মৃণ্ময়ী মন্দিরগুলি, যা মল্ল রাজবংশের শাসনকালে নির্মিত হয়েছিল। এই মন্দিরগুলি বাংলার সৌন্দর্য, সৃষ্টিশীলতা ও বৈচিত্র্যের প্রতীক। বিষ্ণুপুরে আরও অনেক কিছু দেখার ও করার আছে, যেমন মৃণ্ময়ী শিল্প, বালুচরী শাড়ি, বাংলা সঙ্গীত ও নাচ। আমি বিষ্ণুপুরে যেতে সিদ্ধান্ত নিলাম, কারণ আমি এই সব কিছু দেখতে ও অনুভব করতে চাই। আমি আশা করছিলাম যে বিষ্ণুপুর আমাকে একটি অভিনব, আকর্ষণীয় ও শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা দিবে।

■বিষ্ণুপুরের সফরের শুরু: খড়্গপুর থেকে রাঁচি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসেঃ

আমি ২০২৩ সালের ২ ডিসেম্বর খড়্গপুর থেকে রাঁচি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ট্রেনে করে বিষ্ণুপুর পৌঁছালাম। ট্রেনটি খড়্গপুর থেকে বিষ্ণুপুর পৌঁছতে ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট সময় নিল। টিকিটের দাম ছিল ৪৫ টাকা। ট্রেনটি বিকাল ৪ টা ৩০ মিনিটে বিষ্ণুপুর পৌঁছল। বিষ্ণুপুর স্টেশনটি তার সংস্কৃতি ও মৃণ্ময়ী মন্দিরের ছবি অনুসারে নির্মিত।

■বিষ্ণুপুর যুব হোস্টেলে আমার অভিজ্ঞতা: একটি সুবিধাজনক, সস্তা, ও সুন্দর আবাসঃ

আমি বিষ্ণুপুর স্টেশন থেকে রিকশায় করে বিষ্ণুপুর যুব হোস্টেলে গিয়েছিলাম। এটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা নির্মিত একটি হোস্টেল। আমি এখানে মাত্র ২৪৯ টাকায় একটি ভালো ঘর পেয়েছিলাম। ঘরটি পরিষ্কার, বিশাল, ও সুসজ্জিত ছিল। ঘরে ছয়টি বিছানা, দুটি ড্রেসিং টেবিল, ছয়টি চেয়ার, চারটি ফ্যান এবং দুটি বাথরুম ছিল। আমি এমন একটি ভালো জায়গায় এত কম টাকায় থাকতে পারব এমন কখনও ভাবিনি। আমি হোস্টেলের কর্মীদের ও অন্যান্য অতিথিদের সাথে ভালো বন্ধুত্ব গড়েছিলাম। আমি হোস্টেলের সুবিধা ও পরিবেশ খুব উপভোগ করেছিলাম।

■রাসমঞ্চ মন্দিরে আমার প্রথম দর্শন: একটি অদ্ভুত ও ঐতিহাসিক মন্দিরঃ

হোস্টেল থেকে হাঁটা পথে মাত্র ১৫ মিনিটের দূরত্বে এই মন্দির। এই মন্দিরের ইতিহাস আমায় অবাক করেছিল এবং এখানে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল অসাধারণ।

রাসমঞ্চ মন্দিরটি ১৬০০ সালে বীর হাম্বির দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। এটি একটি বৃহৎ ও চতুর্ভুজাকার মন্দির, যার মাঝে একটি উচ্চ ও চতুর্দিকে খোলা মঞ্চ আছে। এই মঞ্চটি রাস লীলা ও অন্যান্য উৎসবের জন্য ব্যবহৃত হতো। এই মন্দিরে কোনো মূর্তি বা প্রতিমা নেই, শুধু মাত্র একটি ছাদ আছে। এই মন্দিরটি বাংলার মৃণ্ময়ী মন্দিরের মধ্যে একটি অনন্য ও অদ্ভুত নমুনা।

আমি রাসমঞ্চ মন্দিরে গিয়ে খুব আশ্চর্য হয়েছিলাম। এই মন্দিরের আকার, রচনা, ও শৈলী আমাকে মুগ্ধ করেছিল। আমি মন্দিরের চারদিকে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম ও মন্দিরের বিভিন্ন অংশের ছবি তুলেছিলাম। আমি মন্দিরের ইতিহাস ও গুরুত্ব সম্পর্কে একজন স্থানীয় গাইড থেকে জানতে পেরেছিলাম। আমি মন্দিরের মঞ্চে উঠে বসেছিলাম ও মন্দিরের চারপাশের দৃশ্য উপভোগ করেছিলাম। আমি মন্দিরের সৌন্দর্য, ঐতিহ্য, ও বৈচিত্র্যের প্রশংসা করেছিলাম।

■গুমগড়ঃ

এটি একটি রহস্যময় বর্গাকার গড়, যার কোনো দরজা বা জানালা নেই। এটি একটি ছোট তিলের উপর অবস্থিত। এটির নির্মাণের বছর ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনেক তথ্য নেই। কেউ কেউ বলেন এটি একটি কারাগার ছিল, আর কেউ কেউ বলেন এটি একটি ধানাগার ছিল।

এই রহস্যময় গুমগড়টির চারপাশে ঘুরে দেখেছিলাম। এটির চারপাশে অনেক আগাছা ও ঝোপঝাড় ছিল ইচ্ছে করছিল এর ভিতরে গিয়ে দেখতে কিন্তু সেই সৌভাগ্য আমার হয়নি।

■পঞ্চরত্ন শ্যামরায় মন্দিরঃ

এই মন্দিরটি ১৬৪৩ সালে মল্ল রাজা রঘুনাথ সিংহ দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। এটি একটি পঞ্চরত্ন মন্দির, যার পাঁচটি শিখর ও চারদিকে তিনটি খিলান রয়েছে। এই মন্দিরের

দেওয়ালে পোড়ামাটির অলংকরণে কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ, মহাভারত, ও সামাজিক জীবনের দৃশ্য চিত্রিত হয়েছে।

এই মন্দিরের দেয়ালে প্রাচীন বাংলার যে সংস্কৃতি ও শিল্পকলার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে তা অতুলনীয়। আমি এই মন্দিরের সিকিউরিটির দায়িত্বে থাকা একজন ব্যক্তির সাথে কথা বলেছিলাম এবং এখানকার স্থানীয় ব্যক্তিদের কাছ থেকে এই মন্দিরের ব্যাপারে জানার চেষ্টা করেছিলাম।

■জোড় বাংলা মন্দিরঃ

এই মন্দিরটি ১৬৫৫ সালে মল্ল রাজা রঘুনাথ সিংহ দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। এটি একটি জোড় বাংলা মন্দির, যার দুটি বর্গাকার ভবন একসাথে যুক্ত হয়েছে। একটি ভবন পোশাক হিসেবে কাজ করে, আর অন্যটি গর্ভগৃহ হিসেবে কাজ করে। এই মন্দিরের দেওয়ালে পোড়ামাটির অলংকরণে রামায়ণ, মহাভারত, ও অন্যান্য পবিত্র হিন্দু শাস্ত্রের দৃশ্য চিত্রিত হয়েছে।

এই মন্দিরের বাংলা শৈলীর সৃষ্টি আমাকে অভিভূত করেছিল। আমি মন্দিরের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। আমি মন্দিরের ইতিহাস ও গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে সেখানকার স্থানীয় মানুষদের কাছে জিজ্ঞেস করছিলাম। মন্দিরের সৌন্দর্য, ঐতিহ্য, ও বৈচিত্র্য আমাকে ভাবার ছিল বাংলার শিল্পকলা ও ঐতিহ্য কতটা বিচিত্র।

■বিষ্ণুপুরের মৃণ্ময়ী শিল্প: এই শিল্পের ইতিহাস, গুরুত্ব, ও আমার অভিজ্ঞতাঃ

বিষ্ণুপুরে মৃণ্ময়ী শিল্প একটি প্রাচীন ও ঐতিহাসিক শিল্প। এই শিল্পে বিভিন্ন ধরণের মৃণ্ময়ী জিনিস তৈরি করা হয়, যেমন মেঝে, কুর্সি, পুতুল, ঘোড়া, হাতি, ও অন্যান্য প্রাণী। এই শিল্পের উৎপত্তি ও বিকাশ বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজবংশের শাসনকালে ঘটে। এই রাজবংশের রাজারা মৃণ্ময়ী মন্দির ও শিল্পের প্রতি বিশেষ আগ্রহ ও সমর্থন দেখিয়েছেন। এই শিল্পের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এতে বাংলার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ধর্ম, ও জীবনধারা প্রতিফলিত হয়। এই শিল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের কাহিনী, উপাখ্যান, ও লোককথা বর্ণিত হয়।

আমি বিষ্ণুপুরে গিয়ে খুব আনন্দিত হয়েছিলাম। এই শিল্পের সৃষ্টিশীলতা, কৌশল, ও মনোরম্য আমাকে মুগ্ধ করেছিল। আমি বিভিন্ন ধরণের মৃণ্ময়ী জিনিস দেখেছিলাম ও কিছু কিনেছিলাম। আমি শিল্পীদের সাথে কথা বলেছিলাম ও তাদের কাজের পদ্ধতি ও পরিশ্রম জানতে পেরেছিলাম। আমি জানতে পেরেছিলাম যে এখানের লোকেরা এই মৃণ্ময়ী ঘোড়া, হাতি, ও অন্যান্য প্রাণীদের পূজা করেন। তারা এদেরকে তাদের ঈশ্বরের রূপ মনে করেন। আমি বিষ্ণুপুরের লোকেদের মনে মৃণ্ময়ী শিল্পের প্রতি সম্মান, ভালোবাসা ও গর্ব অনুভব করেছিলাম। এই শিল্পকলা ও মনমুগ্ধকর এই সৃষ্টিশীলতা শুধু বাংলার নয় সারা ভারতবর্ষের গর্ব।

■উপসংহারঃ

বিষ্ণুপুরে আসার পরে আমি বাংলার প্রাচীন ইতিহাস, সংস্কৃতি, ও শিল্প সম্পর্কে অনেক কিছু শিখেছি। যারা ভ্রমণ প্রেমী ও ইতিহাস ভক্ত, তারা এখানে আসলে শুধু মাত্র পুরাতন মন্দির ও মৃণ্ময়ী শিল্প দেখতে না, বরং এখানের লোকেদের সাথে কথা বলতে ও তাদের ঐতিহ্য, ইতিহাস, ও চিন্তা শিখতে আসা উচিত। কিন্তু শেষে আমি বলতে চাই যে কিছু কিছু বিষয় আমার অনুপযুক্ত মনে হয়েছে, যেমন অনেক প্রাচীন মন্দির গুলি ঠিকমতো রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে না।কিছু মন্দির ও পুরাতন স্থানে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে আগাছা বেড়ে গেছে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, যখন আমি এমন একটি আগাছাযুক্ত মন্দিরে ঢুকি, তখন আমি দেখি বিয়ারের বোতল পড়ে আছে। বাংলার এই পুরনো সংস্কৃতি ও সৃষ্টিশীলতার রক্ষার ভার প্রতিটি বাঙালির।

তবে আমি এখানের লোকেদের থেকে জানতে পেরেছি যে এখানে আরও অনেক পুরাতন মন্দির আছে যেগুলি উদ্ধার করা হচ্ছে।

ইতিহাসের পাতায় জানতে পারা বাঙালির সৃষ্টিশীলতার জীবন্ত উদাহরণ হল এই মন্দিরগুলি। বিষ্ণুপুরে এসেই এই সমস্ত পুরনো মন্দির ও হস্তশিল্পের সম্পর্কে জানতে পেরে আমার এখানে আসার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ হয়েছে। তবে এখানে আরো একবার আসার ইচ্ছা নিয়ে বাড়ি ফিরি।

তথ্যসুত্রঃ

https://bankura.gov.in/
https://www.wikipedia.org/
https://www.wbtourism.gov.in/
https://indianculture.gov.in/

নূতন কলমে
কিছু শিখবো, কিছু লিখবো

শিক্ষা ব্যবস্থায় বিলেতিপনার অবলুপ্তি প্রয়োজন

ধৃতিমান চৌধুরী
স্নাতকরত (ষষ্ঠ অর্ধবর্ষ), বাংলা বিভাগ, দিনহাটা মহাবিদ্যালয়

আমাদের দেশের নাম “India that is Bharat”, না না নাম নিয়ে আমার কোনো আপত্তি নেই থাকবার কথাও নয় তবে আপত্তি আছে, সেটা হলো বিলেতি শিক্ষা ব্যবস্থায়। এখন আপনি প্রশ্ন করতেই পারেন বিলেতি শিক্ষা ব্যবস্থায় আমার আপত্তি ঠিক কি কি কারণে? তবে তার আগে প্রয়োজন একটি বার উপলব্ধির; তাই বলছি চোখ দুটি বুঁজে নিরিবিলিতে একটু মানস পর্যবেক্ষণ করুন।

আপনি যতক্ষন মানস পর্যবেক্ষণ করছেন ততক্ষণ আমি একটা গল্প হলেও সত্যি শোনাই — আমার সাথে পরিচয় হয়েছিল এক সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীর। সে কোনো এক মস্ত ইংরেজি মাধ্যম কনভেন্ট বিদ্যালয়ে পাঠরত ছিল। একদিন কোনো হিসেবের খেলায় আমরা মেতে ছিলাম এমত সময় তার হাতেই ন্যস্ত হয়েছিল হিসেব কষবার দায়িত্ব। তো বিভিন্ন সংখ্যার ভিড়ে যখন আমি তাকে ‘দেড়শো’ লিখতে বলি সেসময় তার প্রত্যুত্তর ছিল —“বুঝতে পারছি না দাদা.....সংখ্যায় বলো”। তখন আমি পরিস্থিতিটা বুঝতে পেরে ‘ওয়ান ফিফটি’ লিখতে বলেছিলাম। এতো গেলো অত্যন্ত ক্ষুদে কারণ এর চাইতেও ভয়াবহ কিছু কারণ রয়েছে।

তবে বাদবাকি কারণ গুলো বলার আগে আমি জানিয়ে দিতে চাই আমি কখনোই ইংরেজি ভাষা শিক্ষার বিরোধী নৈ; তবে বিলেতি শিক্ষা ব্যবস্থার বিরোধী নিশ্চয়ই। সেই কোন কালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটা খাঁটি কথা বলে গিয়েছিলেন—“মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ সম”। সত্যিই কি আজকের দিনে আমরা মাতৃভাষাকে মাতৃদুগ্ধের সমান গুরুত্ব দিয়ে থাকি? প্রশ্নটা আমার যেমন আছে, আমার বিশ্বাস আপনাদেরও মননে রয়েছে।

আজকের দিনে যেকোনো বিলেতি চালচলনের বিদ্যালয়ে চলে যান, দেখবেন সেখানে ক্রমাগত পাঠদান হচ্ছে, এতই হচ্ছে যে থামবার কোনো সম্ভাবনা আপনার চোখে পড়বে না। এখন আপনি বলবেন শিক্ষাদান হচ্ছে তো হচ্ছে তাতে আমার কি সমস্যা? আপনার প্রশ্নটা ক্ষানিকটা যুক্তিযুক্ত তবে পুরোটা নয়।

এবার প্রশ্ন হচ্ছে কি শিক্ষা পাচ্ছে শিক্ষার্থীরা। ময়ূর’কে জানছে Peacock, আলু’কে জানছে Potato, তরমুজ’কে জানছে Watermelon, আঙ্গুর’কে জানছে Grapes ইত্যাদি। তবে এই সব কিছুর ইংরেজি প্রতিশব্দ জানা নিশ্চই ভালো কিন্তু সেটা তখনই

ভালো হবে যখন সেই শিক্ষার্থীরা প্রতিটা জিনিসের নাম নিজের মাতৃভাষায় জানবে। তবে দুঃখের বিষয় কি বলুন তো তারা শিক্ষার্থীদের জানতেই দিচ্ছেন না।

বিলেতিপনার আমদানিতে একটা নতুন জিনিস আপনাদের নজরে এসে থাকবে। বর্তমান সময়ে নিজ নিজ মাতৃ ভাষার বেঠিক ও দুর্ভাগ্যজনক উচ্চারণ। এই ধরুন বাংলা ভাষার নিরিখেই দেখুন। জাতীয়'র উচ্চারণ 'জাতীয়া', সূর্য'র উচ্চারণ 'সুরিয়া', অয়ন'র উচ্চারণ 'আয়ান' ইত্যাদি। যদিও উচ্চারণকারীদের প্রত্যেকেরই মাতৃভাষা বাংলা।

অধুনা বিলেতিপনার শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে মাতৃভাষার প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা। তারা প্রথমে জানছে রুডিআর্ড কিপ্লিং-এর 'The Jungle Book'; জোনাথান সুইফ্ট-এর 'Gulliver's Travels'; উইলিয়াম ব্লেক-এর 'The Tyger', 'The Lamb' ইত্যাদি সাহিত্য উপাদান। তবে জানতেও পারছে না রবি ঠাকুরের 'আমাদের ছোট নদী', 'তালগাছ', 'প্রশ্ন'; কাজী নজরুল ইসলামের 'খুকী ও কাঠবেড়ালি', 'প্রভাতী', 'লিচু চোর' কিংবা রূপকথার 'ডালিমকুমার ও মন্ত্রীপুত্র', 'নীলকমল আর লালকমল', 'মরণকাঠি ও জীয়নকাঠি'র মতো সাহিত্য উপাদান গুলো সম্পর্কে।শুধুই কি তাই? না এতটুকুই নয়, এই সকল শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই নিজের মাতৃভাষায় লেখা কোনো টেক্সট পড়তেও পারে না লিখবার ক্ষমতা তো অলীক স্বপ্নসম। কিন্তু এই বিলেতিপনার শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে শিক্ষার্থীদের ঠেলে যাঁরা পাঠান অর্থাৎ সেই অভিভাবকদেরই কথা বাদ যাবে কেন, ওনাদের জন্য তো ভবানীপ্রসাদ মজুমদার সেই কবেই লিখে গিয়েছেন "বাংলাটা ঠিক আসে না!"। আজকাল শিশুদের মাতৃভাষা না জানা বা না বোঝা যতটা দুর্ভাগ্যজনক ঠিক ততটাই হাস্যকর তাদের অভিভাবকদের আচরণ ও উক্তি। এই সমস্ত অভিভাবকেরা মনে করেন ইংরেজী শিখলেই—"আমার সন্তানটা সর্বোৎকৃষ্ট স্থান লাভ করবে", "আজকালকার দিনে ইংরেজি পড়লেই চলবে মাতৃভাষা সে আবার কি জিনিস"; এছাড়াও এই অভিভাবকদের পরামর্শদাতাও রয়েছেন যাঁরা মনে করেন— "আরে আরে বিলেতি চালচলনের স্কুলে দাও, মাতৃভাষার স্কুলে দিয়ে করবেটা কি!?" ইত্যাদি। এসব মন্তব্য শুনে ভাববেন না যেন এঁনারা অতি সাধারণ কোনো ব্যক্তিবর্গ, এঁনাদের পরিচয় সমাজের বিত্তশালী, শিক্ষাবিদ, আমলা কিংবা প্রখ্যাত সাংবাদিক।হয়তো এঁনারা একাধারে ঠিক, তবে প্রশ্ন কোন দিক থেকে ঠিক? উত্তর বিত্তের দিকে ঠিক।কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার 'মাতৃভাষা এবং সাহিত্য' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন—"একটা কথা আমার অত্যন্ত দুঃখের সহিত মনে পড়িতেছে, আমার জীবনের আমি এমন দুই-একটা কৃতবিদ্য বাঙালীকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিয়াছি, যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষাগুলাই কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াও মাতৃভাষা জানা এবং না-জানার মধ্যে কোন পার্থক্যই দেখিতে পাইতেন না। তাঁহারা সব-কটাই পাস করিয়াছেন এবং সরকারী চাকরিতে হাজার টাকা বেতন পাইতেছেন। অর্থাৎ যে-সব অদ্ভুত কাণ্ড করিতে পারিলে বাঙালী সমাজে মানুষ প্রাতঃস্মরণীয় হয়, তাঁহারা সেই-সব করিয়াছেন। অথচ, বাঙ্গালায় একখানা চিঠি পর্যন্ত লিখিতে পারিতেন না। অবশ্য, না শিখিলে কিছুই পারা যায় না-ইহাতেও অত দুঃখের কথা নাই, কিন্তু বড় দুঃখের কথা এই যে, তাঁহারা নিজেদের এই

অক্ষমতাটা বন্ধু-বান্ধবের কাছে আহ্লাদ করিয়া বলিতে ভালবাসিতেন। লজ্জার পরিবর্তে শ্লাঘাবোধ করিতেন অর্থাৎ ভাবটা এই যে, এত ইংরাজি শিখিয়াছি যে, বাঙ্গালায় একখানা চিঠি লিখিবার বিদ্যাটুকু পর্যন্ত আয়ত্ত করিবার সময় পাই নাই। জানি না, এ-রকম হাজার টাকার বাঙালী আরো কত আছেন, কিন্তু এটা যদি তাঁহারা জানিতেন যে, মাতৃভাষা না শিখিয়াও ঐ অতটা পর্যন্তই পারা যায়, কিন্তু তার ঊর্ধ্বে যাওয়া যায় না, ঐ চলা-বলা খাওয়া-টাকা রোজগার পর্যন্তই হয়, আর হয় না; যথার্থ বড় কাজ, যা করিলে মানুষ অমর হয়, যাঁর মৃত্যুতে দেশে হাহাকার উঠে, তেমন বড় কর্মী কিছুতেই হওয়া যায় না, তাহা হইলে নিজেদের ঐ অক্ষমতার পরিচয় দিবার সময় অমন করিয়া হাসিয়া আকুল হইতে পারিতেন না।"

—সত্যিই; এ-রকম হাজার টাকার বাঙালী আরো কত আছেন, কেই বা জানে কেউ তো আর সমীক্ষা করেননি তাই জানা সম্ভব ছিল না তবে আগামীতে এটা খুবই সহজ হয়ে যাবে যখন এই হাজার টাকার বাঙ্গালীরাই সদর্পে প্রতিষ্ঠা করবে "আমি গর্বিত কেননা আমার বাংলাটা আসেনা"র মন্ত্র।

বিলেতিপনার প্রভাব এখনকার দিনে এতটাই করাল যে ছোট্ট শিশুদের অক্ষর জ্ঞানই আরম্ভ হচ্ছে মাতৃভাষায় নয় বরং বিলেতি কোনো এক ভাষায়। আজকাল 'হাতেখড়ি' অনুষ্ঠানেও বিলেতি ভাষার সাথে শিশুর পরিচয় ঘটানো হয়। শিশুটি জানতেই পারেনা তার অস্তিত্বের রেখা ঠিক কিভাবে টানতে হবে? আচ্ছা এবিষয়ে আবার শরৎবাবুর একটা উক্তিকে উল্লেখ করতেই হয়—"ইংরেজী বা ফরাসী ভাষায় চিন্তা করা যায় না, ইংরেজী লিখতে পার, কিন্তু মাতৃভাষাকে বড় করে না তুললে চিন্তা চিরদিন ছোট হয়ে থাকবে।" — সত্যিই তো আমরা যতই অন্য ভাষাচর্চা করি না কেন, সে সবকিছুরই ভিত্তি হলো আমাদের মায়ের ভাষা। আজকালকার দিনে অভিভাবকদের একটাই বদ্ধমূল ধারণা, ছেলেবেলা থেকে ইংরেজীতেই সব বিষয় পড়লে তাদের সন্তানেরা মাতৃভাষায় শিক্ষালাভকারী শিক্ষার্থীদের থেকে অধিক জ্ঞান অর্জন করবে বা অধিক সৃজনশীল হয়ে উঠবে।এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি উক্তিকে উদ্বৃত করতেই হয়—

"জ্ঞান মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়ো ঐক্য। বাংলাদেশের এক কোণে যে ছেলে পড়াশুনা করিয়াছে তার সঙ্গে য়ুরোপের প্রান্তের শিক্ষিত মানুষের মিল অনেক বেশি সত্য, তার দুয়ারের পাশের মূর্খ প্রতিবেশীর চেয়ে।"

—তিনি এখানে সুস্পষ্ট ভাবে বোঝাতে চেয়েছেন যে জ্ঞান সর্বত্রই একই; সে যে ভাষাতেই গ্রহণ করা হোক না কেন আর যে দেশেই। এবিষয়ে শিশু মনস্তত্ত্ব কি বলছে একটু দেখে নেওয়া যাক—

১)ভাষার ওপর দখল: শিক্ষার্থীদের বক্তব্য সরল ও স্বচ্ছভাবে প্রকাশ করার জন্য, লেখার মধ্যে মনোভাবের সঠিক প্রকাশের জন্য—অর্থাৎ নিজের মনোভাবকে সঠিকভাবে প্রকাশ করার জন্য ভাষার উপর দখল থাকা প্রয়োজন।

২) জ্ঞান অর্জন: মাতৃভাষা সঠিকভাবে শিখলে বিবিধ ক্ষেত্রে পাঠাভ্যাসের মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করতে শিক্ষার্থীরা সক্ষম হয়।

৩) মানসিক ও প্রাক্ষোভিক বিকাশ: শিক্ষার্থী মাতৃভাষার মাধ্যমে তার অনুভূতি, ভাবনা,

অভিজ্ঞতা কথন ও লিখনের সাহায্যে প্রকাশ করতে পারলে তার সুষ্ঠু মানসিক ও প্রাক্ষোভিক বিকাশ ঘটে।
৪) সৃজনক্ষমতার বিকাশ: নিজের অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে সৃজনশীলভাবে প্রকাশের জন্য মাতৃভাষা সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
৫) যৌক্তিক চিন্তনের প্রশিক্ষণ: শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতার সঠিক বিকাশের জন্য যৌক্তিক চিন্তনের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। মাতৃভাষায় এই চিন্তন পূর্ণতা লাভ করে।
অর্থাৎ,এতটুকু তো স্পষ্ট যে মাতৃভাষাই একমাত্র মাধ্যম যার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী নিজের ভাষাকে জানবে সাথে সাথেই জীবনে প্রকৃত সফলতার চূড়ায় পৌঁছতে পারবে। অন্যথায় তারা সেই হাজারটাকার বাঙ্গালী ব্যতীত আর কিছুই হয়ে উঠতে পারবে না।

আমাদের সৃজনশীলতা, সে তা আমাদের মাতৃভাষাতেই হোক কিংবা বিলেতি কোনো ভাষায় তার বিকাশ ঘটাতে পারে এক এবং একমাত্র মাতৃভাষার প্রতি আনুগত্য। ধরুন আপনি কোনো পরীক্ষায় বসেছেন এবং সেখানে আপনাকে আপনার মাতৃভাষায় বা বিলেতি কোনো এক ভাষায় লিখতে বলা হয়েছে; আপনি মুখস্থ করে গেলেন ও লিখে দিয়ে আসলেন তবে তাতে সৃজনশীলতার কোনো জায়গাই থাকবে না। আর আপনি ঠিক তখনই আপনার মুখস্থ বিদ্যার ব্যবহার করবেন যখন আপনি সৃজনশীল হয়ে উঠতে পারবেন না। তাই আমাদের প্রয়োজন সঠিক শিক্ষা, সঠিক মাধ্যম ও সঠিক পরিবেশ; যা হবে আমাদের মাটির। যাতে একজন বাংলা মাতৃ ভাষাভাষী শিশু বা বালক-বালিকা তার বাড়িতে সাধারণ কথাবার্তায় 'বাইশে', 'তেইশে' শব্দ'র পরিবর্তে 'টুয়েন্টি সেকেন্ড', 'টুয়েন্টি থার্ড' ব্যবহারে কোনো অতিরিক্ত গৌরব নেই তা অনুধাবনের শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। যাতে
"আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে,
বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে।
পার হয়ে যায় গরু, পার হয় গাড়ি,
দুই ধার উঁচু তার, ঢালু তার পাড়ি।"কে ঢেকে দিয়ে প্রথম পাঠে
"Little Lamb who made thee
Dost thou know who made thee
Gave thee life & bid thee feed.
By the stream & o'er the mead;
Gave theeclothing of delight,
Softest clothing wooly bright;
Gave theesuch a tender voice,
Making all the vales rejoice!"পড়লে যে, কেউ অতিরিক্ত জ্ঞানী বা মেধাবী হয়ে ওঠে না তা আত্মস্থ করতে পারে। তবেই আমাদের মধ্যে থাকা হাজার টাকার বাঙ্গালীরা কথায় না হয়ে কাজেও হাজার টাকার হয়ে উঠতে পারবে। এসবকিছুরই জন্য আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিলেতিপনার অবলুপ্তি প্রয়োজন যার মাধ্যমে আমরা সকলে যেমন মাতৃভাষায় ঠিক চিঠি লিখতে পারবো তেমনই অন্যান্য বিলেতি ভাষাতেও আর্টিকেল

রচনা করতে পারবো অনায়াসে। মাতৃভাষা আমাদের মেধা, বিলেতি আমাদের প্রয়োজন।

তথ্যসূত্রঃ
১) ‘মাতৃভাষা এবং সাহিত্য’ প্রবন্ধ, শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
২) ‘শিক্ষার বাহন’ প্রবন্ধ, “শিক্ষা”, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী,সংস্করণ– শ্রাবণ ১৩৪২, পৃষ্ঠা – ১৮০
৩) শরৎ স্মৃতি পাঠাগার ও মিউজিয়াম
৪) “ভাষা শিক্ষণের পদ্ধতি ও প্রয়োগ (বাংলা)”; ড. সুজাতা রাহা ও বৈশালী বসু; আহেলি পাবলিশার্স, ৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট,কলকাতা-৭০০০০৯; অষ্টম সংস্করণ-সেপ্টেম্বর ২০২২; পৃষ্ঠা-৪২,৪৩

নূতন কলমে
কিছু শিখবো, কিছু লিখবো

একটি ঐতিহাসিক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা

খুশবু পাটোয়ারী
স্নাতকরত (ষষ্ঠ অর্ধবর্ষ), বাংলা বিভাগ, দিনহাটা মহাবিদ্যালয়

প্রথমেই বলি, 'মানুষ সুদূরের পিয়াসী'। ভ্রমণ করতে কার না ভালো লাগে? খুব অল্পসংখ্যক মানুষজন আছেন , যারা ভ্রমণ করতে অপছন্দ করেন। ভ্রমণ কথার অর্থ হল অচেনাকে চেনা, অজানাকে জানা। ভ্রমণ আমাদের মনে আনন্দময় অনুভূতির সঞ্চার করে। তেমনি ঐতিহাসিক ভ্রমণের একাধিক বিশেষত্ব রয়েছে। ঐতিহাসিক ভ্রমণের দ্বারা আমরা অতীতের নিদর্শনগুলির মাঝে ফিরে যাই। আর এই নিদর্শনগুলি ইতিহাসের সঙ্গে মানবমনের পরিচয় ঘটিয়ে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যোগসূত্র স্থাপন করে।

মানুষ ছোটো থেকে বড়ো হওয়াকালীন যেসমস্ত নিদর্শনগুলি বই-পুস্তক পড়ে জানতে পারে, ঐতিহাসিক ভ্রমণের দ্বারা সেসব প্রত্যক্ষভাবে ছুঁয়ে দেখতে সক্ষম হন। এর মাধ্যমে অতীতকালের শিল্প, সংস্কৃতি ও চারুকলার সাথে বর্তমানের মানুষেরা পরিচিত হতে পারে। নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে এবং এখানেই ঐতিহাসিক ভ্রমণের সার্থকতা বিরাজমান।

কিছুদিন আগেই এরকমই একটি ঐতিহাসিক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা হয় আমার। গত ১৫ই জানুয়ারী,২০২৪ ; নিউ কোচবিহার থেকে তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেসেই মুর্শিদাবাদের উদ্দেশ্য যাত্রা আরম্ভ করি। ভ্রমণটি ছিল আমাদের পারিবারিক ভ্রমণ। কয়েকজন দাদা, দিদি, জেঠিমা এবং মা —সব মিলিয়ে ৯-১০ জন ছিলাম। নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছে যাই খাগরাঘাট স্টেশনে ; সেখান থেকে সোজা বহরমপুর শহর। বহরমপুরেই আমরা থাকি এবং সেখান থেকেই কয়েকদিন ঘোরাফেরা চলে।

অতঃপর আমরা সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে বেরিয়ে পরলাম — HAZARDUARI দেখতে। হাজারদুয়ারী প্রাসাদটি ভাগীরথী নদীর তীর থেকে ৩৫-৪০ ফুট দূরে অবস্থিত। প্রাসাদটির ভিতরে ১০০০(এক হাজার)টি দরজা রয়েছে বলে, হাজারদুয়ারী নামকরণ করা হয়েছে বলে মনে করা হয়। তবে প্রাসাদটির আসল দরজা ৯০০(নয়শো)টি এবং বাকি ১০০(একশো)টি দরজা কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হয়েছে। আমরা সেখানে গিয়ে জানতে পারি, এই প্রাসাদটি ইংরেজদের সঙ্গে নবাবের মিটিং এর জন্য ব্যবহৃত হত । ইংরেজরা এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা এই প্রাসাদেই থাকত। প্রাসাদের ভিতর নবাবী আমলের নানান ধরনের হাতিয়ার, কামান, রুপোর সিংহাসন, চীনামাটির বাসনপত্র, বিভিন্ন কাঠের আসবাবপত্র, ফুলদানি, নবাবের শেরবানি,পায়জামা প্রভৃতি আরো অনেক কিছু এবং বিশেষভাবে সংরক্ষিত কুমির (যা নবাব বিহারে শিকার করেন) । আকুল

দৃষ্টিভরে দেখলাম এবং এ সমস্ত কিছু দেখে এক মুহূর্তে আমি সেই ঐতিহাসিক আমলে ফিরে গেলাম। ও হ্যাঁ প্রাসাদের ভিতর সবথেকে একটি মজার বিষয় হল— এখানে একটি জাদুর আয়না রয়েছে, সেখানে কোনো ব্যাক্তি নিজের মুখ নিজেই আয়নায় দেখতে পারেন না ;তবে অপরের মুখ ঠিকই দেখতে পারেন। এই বিষয়টি নিজেই পরীক্ষা করে দেখলাম খুবই ভালো লেগেছিল।

চিত্র: হাজারদুয়ারী মিউজিয়াম

এরপর হাজারদুয়ারী প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এগিয়ে গেলাম ইমামবাড়ার দিকে। হাজারদুয়ারী প্রাসাদের বিপরীত দিকেই এই রাজকীয় নিজামত ইমামবাড়া। শুধুমাত্র মহরম ব্যতীত সবসময় এই ইমামবাড়ার সমস্ত দরজা বন্ধ থাকে। শুনেছিলাম মহরম এর সময় ১০ দিন খোলা থাকে।

হাজারদুয়ারী ও ইমামবাড়ার মাঝে রয়েছে একটি Clock Tower। এর উপরে রয়েছে একটি বৃহৎ ঘণ্টা। Clock Tower টি দীর্ঘদিন যাবৎ পরে থাকার জন্য বন্ধ রয়েছে। সেখান থেকে বেশ কয়েকটি কাঠের কলম এনেছিলাম , কলমের গায়ে 'Hazarduari-হাজারদুয়ারী ' খোদাই করা ছিল। সব মিলে খুবই সুন্দর ছিল হাজারদুয়ারী মিউজিয়াম প্যালেস।

চিত্র: ইমামবাড়া ও Clock Tower

এরপর আমরা যাই KATRA MASJID (কাটরা মসজিদ) এ ।এই মসজিদেই রয়েছে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ'র সমাধি । সেখান থেকে সোজা মতিঝিল, বিশাল ঝিলের পাশে এক অতি প্রাচীন মসজিদ; সম্পূর্ণ রহস্যময়তায় ঘেরা এই মতিঝিল পার্ক। এরপর আমরা যাই "জাহানকোষা কামান" দেখতে। 'জাহানকোষা' কথাটির অর্থ 'বিশ্ববিধ্বংসী' । লোহার তৈরি কামানটির একটি বিশেষত্ব হলো — কামানটির দুটি দিক দুটি মাপের। অর্থাৎ একটি

পাশ যদি হয় ১৩ ফুট লম্বা, তবে অপর পাশটি হবে ১৪.৫ ফুট লম্বা, যা আমি নিজেই মেপে দেখেছিলাম। এরপর আমরা যাই মীরজাফরের বাড়ি(তালাবন্ধ), মীরজাফরের বংশধরের ঐতিহাসিক ১১০০ কবরস্থান, বিখ্যাত জগৎশেঠের বাড়ি, আজিমুন্নেশা বেগমের জীবন্ত সমাধি প্রভৃতি স্থানগুলি আমরা দু চোখ ভরে দেখেছিলাম।

চিত্র: কাটরা মসজিদ

চিত্র: জাহানকোষা কামান

চিত্র: মীর জাফর'র বাড়ি

চিত্র: জগৎ শেঠ'র বাড়ি

চিত্র: আজিমুন্নেসা বেগম'র জীবন্ত সমাধি

অতঃপর আমাদের শেষ গন্তব্য স্থান "কাঠগোলা বাগান" । সত্যিই অপূর্ব রহস্যময় সুন্দর ছিল এই স্থানটি। বৃহৎ পরিসরে স্থান দখল করে আছে বাগানটি।টিকিট কেটে আমরা ভিতরে প্রবেশ করলাম; কাঠগোলা বাগানে রয়েছে একটি অপরূপ হলুদ রংয়ের প্রাসাদ

যা নজর কেড়েছিল সকলের, যার ভিতরে রয়েছে নবাবী আমলের নানান আসবাবপত্র, ফুলদানি, আর একটি সুবৃহৎ খাট, এছাড়াও আরো অনেক কিছু রয়েছে। প্রাসাদের সামনে রয়েছে একটি পুরনো মন্দির, পুকুর, সুড়ঙ্গ পথ, একটি পাখিরালয় (নানান ধরনের বিদেশি পাখি সংরক্ষিত), নাচের আসর এবং অত্যধিক সুন্দর একটি গোলাপ ফুলের (বিভিন্ন রঙের)বাগান যা আমার চোখে এখনো ভেসে ওঠে।

চিত্র: কাঠগোলা বাগান

যাই হোক, সব ভ্রমণের একটি শেষ আছে। টানা পাঁচদিনের ভ্রমণ শেষ করে ফিরে এলাম নিজের শহরে। দেখলাম অনেক, জানলাম অনেক না জানা বিষয়, নবাবী আমলের অসংখ্য জিনিস দেখলাম মুগ্ধ হয়ে এবং অজস্র অজানা তথ্য সংগ্রহ করলাম এই জীবনে। সেই ঐতিহাসিক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আমার মনে যে আনন্দের সঞ্চার ঘটিয়েছিল, তা কখনই ভোলার নয়। আবারও হয়তো কোনো একসময় ভ্রমণের প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ছুটে যাবো অপরূপ সৌন্দর্য্যে ঘেরা ঐতিহাসিক নবাবের শহরে।

কিছু শিখবো, কিছু লিখবো

স্বাধীনতা-উত্তর বঙ্গদেশের খন্ডচিত্র

ড. সুভাষ চন্দ্র দাস
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, দিনহাটা মহাবিদ্যালয়

আমরা জানি, চিৎ হয়ে জলের উপরিতলে ভাসলে জল দেখা যায় না, যে জল চারপাশে বেষ্টন করে থাকে তার তল বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে। মানুষ তো সম্পর্ক বাঁচিয়ে রেখেই এগিয়ে চলেছে লক্ষ বছর। আগুনকে ঘিরে মানুষের সমবেত ওম গ্রহণের অভ্যাস যদি হয় দু'লক্ষ বছরের, স্বল্প ওয়াটের হিটারে একা একা ক্রীমমাখা পা সেঁকার ইতিহাস বড়জোর একশো বছরের। কাজেই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, লক্ষ বছরের অভ্যাসকে কি একশো বছরের ইতিহাস এত সহজে জিতে নিতে পারে! হয়তো পারে না, তাই একই জীবনে দুই ক্ষেত্র তৈরি হয় - একটা লড়াই চলে ভেতরে ভেতরে। একই রকম ভাবে মানুষের স্ব-ভাবের বিরুদ্ধে যখন কোনো ব্যবস্থা চাপানো হয়, তখন মানুষের ভিতর থেকেই গড়ে ওঠে প্রতিরোধ প্রবণতা। সমস্যাও এর থেকেই। যুক্তি তর্ক এই কারণেই। আর এই উৎকেন্দিক মানসিকতার কথা মাথায় রেখেই আমরা যদি স্বাধীনতা-উত্তর বঙ্গজীবনের দিকে তাকাই তাহলে তা অবশ্যই ভিন্ন কথা শোনায়।

এই সময় জুড়ে জীবনের যে বিচিত্র প্রকৃতি নির্দিষ্ট হয়েছে বঙ্গে, মনের যে অসহায় বৃত্তি ও মানসিকতার নিবিড় নীরব একাকিত্ব নির্দিষ্ট হয়েছে তা নিয়ে ভাবনা চিন্তার অবকাশ আছে। লক্ষণীয়, চল্লিশের দশকের শুরু থেকেই বাংলা ও বাঙালির সঙ্কট ও মূল্যের হিসেবে ক্ষয়ে যাওয়া বোধ জন্ম নিতে থাকে। মনস্তাত্ত্বিক দার্শনিকরা যে বলেন, আমাদের অভাব কোথায় - তার সবই দেখিয়ে দেন অন্য কেউ এবং অন্যদের সম্মিলিত দৃষ্টির নিরিখেই আমাদের যাচাই। আর আমাদের এই যাচাইয়ের শর্তেই আমরা সনাক্ত করি আমাদের জেগে থাকা, শুয়ে থাকা, এগিয়ে থাকা ও পিছিয়ে থাকা মানুষগুলিকে। দেখতে পাই কীভাবে বঙ্গ সমাজে ঐতিহ্য, প্রগতি, সংগতি, আদর্শ - এসবের ভাবগত মহত্ত্বের পরিবর্তে হিসেব নিকেশের পরিসংখ্যান মুখ্য হতে থাকে, আমাদের চোখের কানের মনের ত্তপর চাপ বাড়তে থাকে।

আমরা জানি, ৩রা জুন পরিকল্পনা বা মাউন্ট ব্যাটেন পরিকল্পনার কথা, যা ভারতবর্ষকে বিচ্ছিন্ন করে ভারত ও পাকিস্তান করেছে। ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করেই ১৮ই জুলাই ব্রিটেনে পাশ হয়েছে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স অ্যাক্ট। মূলত: এই আইনের দ্বারাই ভারতবর্ষকে টুকরো করে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান ও ১৫ই আগস্ট ভারত নামের দুটি স্বতন্ত্র দেশ গড়ে ওঠেছে। আর এই দেশ ভাগের ফলেই ব্রিটিশ-ভারতের বঙ্গ-প্রদেশ টুকরো হয়ে ভারতের ও পাকিস্তানের অংশ হয়ে গেছে। প্রধানত ধর্মের উপর ভিত্তি করে হিন্দু অধ্যুষিত পশ্চিমবঙ্গ ভারতের এবং মুসলিম অধ্যুষিত পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হয়েছে। আর এই নতুনভাবে বিভক্ত বঙ্গ-প্রদেশের ক্ষমতা হস্তান্তর

করা হলে দুই বঙ্গের সাধারণ মানুষ মানসিক ও আত্মিক সঙ্কটে অসহায় হয়ে পড়েছে।

লক্ষণীয়, ১৯৪৭–এ দেশ স্বাধীন ও দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে লক্ষ লক্ষ হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। ব্যাপক অভিবাসনের ফলে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য ও বাসস্থানের সমস্যা দেখা দেয়। এরই মধ্যে ১৯৫২–তে স্বাধীন ভারতের পশ্চিমবঙ্গে প্রথম বিধানসভা নির্বাচন হয়। বিপুল ভোটে জয়ী হয় ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। রাজত্ব চলে ১৫ বছর। এরপর ১৯৬৭–র নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস হেরে যায়। সরকার গড়ে বাংলাকংগ্রেস যুক্তফ্রন্ট এবং পরে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট। এই ১৯৬৭-তেই উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়িতে চারু মজুমদার, কানু সান্যাল প্রমুখের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে কৃষক বিদ্রোহ, অবশেষে তা নকশালবাদী আন্দোলন। নকশালরা চায় সশস্ত্র বিপ্লব। আর এই আন্দোলন সশস্ত্র পথ অবলম্বন করায় সামাজিক অস্থিরতা দানা বাঁধে। ১৯৬৭–তেই কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার বরখাস্ত হয়। ১৯৬৮-তে রাজ্যে জারি হয় রাষ্ট্রপতি শাসন। এরপর রাজ্যে নির্বাচন হয় ১৯৬৯-এ। বিধানসভার বৃহৎ দল হিসেবে সিপিআই(এম) উঠে এলেও বাংলা-কংগ্রেসের সমর্থনে নিযুক্ত হয় যুক্তফ্রন্ট সরকার। ১৯৭০–এ রাজ্যে আবার রাষ্ট্রপতি শাসন ফিরে আসে। এছাড়া এই ১৯৭০ সালেই রাজ্য জুড়ে নকশালপন্থীদের সশস্ত্র আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ নেয়। এরপর ১৯৭১–এর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টকে হারিয়ে পুনরায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গণতান্ত্রিক জোট রাজ্যের ক্ষমতা দখল করে। এই বছরই পুনরায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয় রাজ্যে। এছাড়া এই ১৯৭১ –সালেই বাংলা দেশের মুক্তি যুদ্ধ। এই সময় প্রায় এক কোটি, মূলত: হিন্দু শরণার্থী বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেয়। বঙ্গে পুনরায় দেখা দেয় বাসস্থান ও কর্মসংস্থান সমস্যা। গড়ে ওঠে উদ্বাস্তু ও কলোনীর মিশ্রসামাজিক সংস্কৃতি, জীবনের নতুন সংজ্ঞা। ১৯৭২ –এ পশ্চিমবঙ্গে সরকার পরিচালনার দায়িত্বে আসে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস – প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট। শুরু হয় নকশাল দমন অভিযান। ১৯৭২-এ নকশাল-প্রধান চারু মজুমদার ধরা পড়েন এবং মারা যান। নকশালদের সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার সশস্ত্র বিপ্লব স্তিমিত হয়ে পড়ে। এরই মধ্যে ১৯৭৪ সালের মহামারী, রাজ্য জুড়ে মানুষের মৃত্যু মিছিল। ১৯৭৫ –এ দেশ জুড়ে জারি হয় জরুরী অবস্থা। এমন সময় রাজ্যে পুলিশের সঙ্গে নকশালদের চরম লড়াই শুরু হয়। রাজ্য জুড়ে চলতে থাকে তুমুল অরাজকতা। এরই মধ্যে ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে পুনরায় উত্থান ঘটে বামফ্রন্টের। আর এই পর্ব ও পর্বান্তরের কথা স্বতন্ত্র ও স্বতন্ত্র আলোচিতব্য।

আসলে বঙ্গ ইতিহাসের কঠিন মাটিতে যাপনের ক্ষেত্রে যে বৃক্ষ রোপিত হয়েছিল ও হচ্ছে তার ফল আজও আমরা পাচ্ছি এবং পেতে থাকবো। কিন্তু তবু ভাবতে চাওয়া এই যে, সময় ও সমাজ বদলে যাওয়া মানে কেবল রাস্তা-ঘাট কিংবা ঘর-বাড়ীতে নয়, তার বদল ঘটে মন - মেজাজ ও মানসিকতাতে। বস্তুত, আমরা যদি আত্মমগ্ন হতে ভুলে যাই তাহলে আমাদের সঙ্গে একটা সামান্য কীটেরও কোনো ভেদ থাকে না।

পরি সমাপ্ত

(৫১)